POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 32

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 10 আগস্ট, 2023 22 মহররম 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হুকুকুল ইবাদ

২৩৯৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট দিয়ে যখন কোন এমন ব্যক্তির জানাযা আসত যার উপর ঋণ থাকত, তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করতেন, সে কি নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য কোন সম্পদ রেখে গেছে?' লোকেরা যদি বলত , 'হ্যাঁ', তবে তিনি জানাযা পড়াতেন, অন্যথায় মুসলমানদের বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। আল্লাহ্ তা'লা যখন বিজয় দান করলেন তখন তিনি (সা.) বললেন, 'আমি মুসলমানদের তাদের (আত্মীয়দের) থেকেও বেশি কাছের। তাই মোমেনদের মধ্য থেকে যে মৃত্যু বরণ করে আর ঋণ রেখে যায় তার ঋণ পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব আর যে কেউ সম্পদ রেখে যায় সেগুলো তার ওয়ারিসদের।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) এর হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন- ফিকাহবিদগণ এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নও তুলেছেন যে, ঋণগ্রস্তদের জানাযার নামায না পড়া এক প্রকার সতর্কতা না নিষেধাজ্ঞা? কিন্তু যাতে মানুষের হুকুকুল ইবাদ প্রদানের বিষয়ে চিন্তা থাকে এবং এটিকে সাধারণ বিষয় মনে না করে। কিন্তু যদি ঋণগ্রস্তের জানাযার নামা পড়া নিষিদ্ধ হত তবে সাহাবাদের নামায পড়তে বলতেন না। এর থেকে জানা যায় যে, এটা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় নয় বরং সতকর্তার জন্য ছিল।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৬ মে ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিভিন্ন সূত্র থেকে একত্রিত করা সমস্ত হাদীসগুলিকে যখন আমরা সামগ্রিকভাবে যাচাই করি, তখন একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আঁ হযরত (সা.) অবশ্যই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণের সংবাদ দিয়েছেন।

একথাই যদি সত্যি হয় যে, মুসলমানদের কাছে কুরআন ভিন্ন যা কিছু পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেগুলি সবই মিথ্যার, জোচ্চুরি, প্রবঞ্চনা, অনুমান এবং কল্পনার স্তুপ, তবে তো ইসলামের খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিভিন্ন সূত্র থেকে একত্রিত করা সমস্ত হাদীসগুলিকে যখন আমরা সামগ্রিকভাবে যাচাই করি, তখন একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আঁ হযরত (সা.) অবশ্যই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণের সংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর আমরা যখন আহলে সুন্নাতুল জামাতের হাতে থাকা এই হাদীসগুলির সঙ্গে ইসলামের অন্যান্য ফির্কা যেমন- শিয়ারা যেগুলির উপর নির্ভর করে, তাদের হাতে থাকা হাদীসগুলিকে মিলিয়ে দেখি, তখন এমন হাদীসের 'তাওয়াতুর' (হাদীস বর্ণনাকারীদের নিরবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল) আরও বেশি দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। পাশাপাশি সুফীগণের শত শত পুস্তকও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এরপর আমরা যখন আপাতদৃষ্টিতে আহলে কিতাব তথা খৃষ্টানদের পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি দিই, সেখানেও আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই। সেই সঙ্গে ইলিয়াস নবীর আকাশ থেকে অবতরণ করার বিষয়ে হযরত মসীহর সেই সিদ্ধান্তের বিষয়ে বাইবেল থেকে জানা যায় যে, এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী কখনই আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হয় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মসীহ্‌র আগমণের সংবাদ প্রতিটি যুগে এমন জোরালো ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, এর 'তাওয়াতির'কে অগ্রাহ্য করা ঘোর অজ্ঞতা বলে প্রতিপন্ন হবে। আমি সত্য সত্য বলছি, ইসলামের যে সব পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি লিপিবদ্ধ আছে, একত্রিত করা হলে এমন পুস্তকের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেত। অবশ্য ইসলামী বই পুস্তক সম্পর্কে সবিশেষ পরিচিত নন এমন ব্যক্তিকে বোঝানো একটু কঠিনই হবে। বস্তুতপক্ষে এমন আপত্তিকারীরা দুর্ভাগ্যবশত এতটাই অজ্ঞ হয়ে থাকে যে, এমন বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ কতটা শক্তিশালী ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেটা তাদের বোধগম্যের উর্দ্ধে। অনুরূপভাবে এই আপত্তিকারী ব্যক্তি কারো কাছ থেকে শুনেছে যে অধিকাংশ হাদীস 'আহাদ' (অনুমান ভিত্তিক) এর পর্যায়ভুক্ত এবং সে কালক্ষেপ না করেই এই সিদ্ধানে উপনীত হয়েছে যে কুরআন করীম ব্যাতিরেকে ইসলাম স্বীকৃত যা কিছু প্রামাণ্য বিষয়াদি রয়েছে সেগুলি সবই ভিত্তিহীন ও সংশয়পূর্ণ, এবং মোটেই অকাট্য ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা মারাত্মক ভুল, যার প্রথম ফলাফল হল ধর্ম ও বিশ্বাস ধ্বংস হয়ে যাওয়া। কেননা, একথাই যদি সত্যি হয় যে, মুসলমানদের কাছে কুরআন ভিন্ন যা কিছু পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেগুলি সবই মিথ্যার, জোচ্চুরি, প্রবঞ্চনা, অনুমান এবং কল্পনার স্তুপ, তবে তো ইসলামের খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে।কারণ ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত ব্যাখ্যা ও বিশদ জ্ঞান আমরা মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকেই লাভ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, তার আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি কুরআন দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। কিন্তু কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে ভোরে দুই রাকাত সুন্নত ও দুই রাকাত ফরজ, এরপর যোহরে চার রাকাত ফরজ এবং চার ও দুই রাকাত সুন্নত, মগরিবে তিন রাকাত এবং এশার নামাযে চার রাকাত ফরজ রয়েছে। অনুরূপভাবে যাকাতের খুঁটিনাটি বিবরণ জানার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে হাদীসের মুখাপেক্ষী। অনুরূপভাবে ইবাদত, পারস্পরিক সম্পর্ক, চুক্তিপত্র প্রভৃতির আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত হাজার হাজার খুঁটিনাটি রয়েছে। সর্বজনবিদিত সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা শুধুই বাতুলতা এবং বিষয়কে দীর্ঘায়িত করা। এছাড়াও এই হাদীসগুলিই আবার ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক ও মূল উৎস। হাদীসের বর্ণনাগুলি যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে আমরা একথাও নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলি আঁ হযরত (সা.) এর সাহাবা ছিলেন যাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে খলিফা হয়েছেন এবং সেই ক্রমেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। কেননা হাদীসের বর্ণনার উপর বিশ্বাস না করা হলে এই সব মহান ব্যক্তিদের অস্তিত্বের কথা নিশ্চিত করে বলার মত কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে খুব সম্ভব যে, সমস্ত নামই কাল্পনিক, আবু বকর, উমর, উসমান বা আলি নামে কেউ ছিল না। কেননা আপত্তিকারী মিঞা আতা মহম্মদ এর যুক্তি অনুসারে এই সমস্ত হাদিস 'আহাদ' (অনুমান ভিত্তিক) আর কুরআন করীমে কোথাও তাদের নামের কোন উল্লেখ নেই, তাই, এই নীতির অনুসরণে কিভাবে এই হাদীসগুলি সত্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে আমরা কি অস্বীকার করতে পারি যে আঁ হযরত (সা.)-এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ এবং মাতার নাম আমেনা, দাদুর নাম আব্দুল মোতালেব, তাঁর এক স্ত্রীর নাম খাদিজা এবং অপর একজনের নাম আয়েশা, একজনের নাম হাফসা এবং তাঁর দাঈ মার নাম হালিমা ছিল না? আর আঁ হযরত (সা.) যে হিরা গুহায় গিয়ে ইবাদত করতেন, তাঁর কতিপয় সাহাবা আবিসিনয়া হিজরত করেছিলেন, আঁ হযরত (সা.) নবুয়্যতের পর দশ বছর পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন সেকথাও কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা যেগুলির বিষয়ে কুরআন করীমে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি। এই সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতা কেবল হাদীস দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই সমস্ত ঘটনাবলীকে এই কারণের উপর ভিত্তি করে অস্বীকার করা যায় যে হাদীসের কোন গুরুত্ব নেই? যদি এমনটাই হয়, তবে মুসলমানদের জন্য আঁ হযরত (সা.) এর জীবনীর কোন একটা দিকও বর্ণনা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। (শাহাদাতুল কুরআন, পৃ: ১-২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

যদি ওসীয়্যত করে থাকেন তবে সত্যি কথা বলে নিজের উপার্জন অনুপাতে চাঁদা দিন,অন্যথায় যদি বাধ্যবাধকতা থাকে, সঠিক হারে চাঁদা দিতে না পারেন তবে ওসীয়্যত বাতিল করে নাও। পরে যখন অবস্থার উন্নতি হবে তখন ওসীয়্যত করে নিবেন। ওসীয়্যতের ক্ষেত্রে সততা ওসীয়্যতের চেয়ে বেশি জরুরী। আমার একটি বই রয়েছে, 'বৈবাহিক সংক্রান্ত সমস্যাবলী ও এর সমাধান'। বইটি পড়ুন। এর উদ্ধৃতিগুলি বের করে বাড়ি বাড়ি সকলকে দিন। দ্বিতীয় বিষয়টি হল ধৈর্য ও উদ্যম। মহিলা ও পুরুষদের মাঝে ধৈর্যের অভাব রয়েছে। সামান্য বিষয় চরম রূপ ধারণ করে। পুরুষদেরও নম্র ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিত আর অপরদিকে মহিলাদের মধ্যেও সহনশীলতা তৈরী হওয়া উচিত। এর জন্য মাঝে মধ্যে সেক্রেটারী তরবীয়তের দায়িত্ব হল ইসলাহি কমিটি এবং তরবীয়তের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা যাতে পুরুষ ও মহিলারা প্রশিক্ষণ পেতে থাকে।

নিজেদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করুন, তারাও যেন ইসলামের শিক্ষা বুঝতে পারে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে ফিনল্যান্ডের মজলিস আমলার সদস্যদের সাথে সাথে অনলাইন সাক্ষাত

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে কানাডা জামাতের ওয়াকফীনে নও মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া -র সাথে অনলাইন সাক্ষাত করেন। ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড) এম.টি.এ স্টুডিও থেকে তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ফিনল্যান্ডের মজলিস আমেলার সদস্যরা হেলনিস্কির আহমদীয়া মুসলিম মিশন থেকে থেকে অন-লাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

হুযুর আনোয়ার মজলিসের সদস্যদেরকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে নামায প্রত্যেক মুসলমানের প্রাথমিক কর্তব্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমস্ত আমেলা সদস্যকে এ বিষয়ে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মজলিসের সদস্যদেরকে সময়ের কুরবানী এবং ওয়াকফে আরজির ক্ষেত্রেও আদর্শ হওয়া হওয়া উচিত যেখানে তারা ধর্ম সেবার জন্য সময়ের কুরবানী করে থাকে।

সেক্রেটারী মাল নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করলে হুযুর জানতে চান যে ওসীয়্যতে লোকেরা নিদ্দের হিস্সা আমদ এর ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করে দেয় কি না।

সেক্রেটারী মাল বলেন, হুযুর! এ বিষয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। কিছু মানুষ এমন আছেন যাদের চাঁদা আরও বেশি হওয়া উচিত বলে মনে হয়। বাজেট সঠিকভাবে তৈরী করা হয় নি। এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে বলুন, যদি ওসীয়্যত করে থাকেন তবে সত্যি কথা বলে নিজের উপার্জন অনুপাতে চাঁদা দিন,অন্যথায় যদি বাধ্যবাধকতা থাকে, সঠিক হারে চাঁদা দিতে না পারেন তবে ওসীয়্যত বাতিল করে নাও। পরে যখন অবস্থার উন্নতি হবে তখন ওসীয়্যত করে নিবেন। ওসীয়্যতের ক্ষেত্রে সততা ওসীয়্যতের চেয়ে বেশি জরুরী।

এরপর চাঁদা আম প্রদানকারীদের বিষয়ে হুযুরর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, হুযুর! চাঁদা আম প্রদানকারীদের মাঝে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যাদের কোন আয় নেই, যারা সরকারি ভাতার উপর নির্ভরশীল। তাদের অধিকাংশের অনুযোগ, আমরা ভাতা এত অপর্যাপ্ত পাই যাতে আমাদের খরচ চলে না। এদিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা থেকে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ঠিক আছে, তাদেরকে ব লুন,আপনারা ভাতা কম পান তাই এর থেকে অব্যহতি চেয়ে নিন। চাঁদা যতটা দিতে পারবেন ততটাই দিন, কিন্তু নিজেদের আয় কম করে লেখাবেন না। তাদেরকে বলে দিন, আমাদের যা আয় সেই অনুপাতে চাঁদা দিতে পারব না আর আমাদেরকে কম হারে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। তারা অনুমতি চেয়ে নিক, আমি এমন প্রত্যেককেই অনুমতি দিয়ে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লোকদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। জোর করবেন না, এটা কোন আয়কর নয়। যাদের সমস্যা আছে তাদের সমস্যার কথা আমরা শুনি, কিন্তু তাদেরকে লিখতে হবে যে, এমন অবস্থার মধ্যে আমাদের আয় অনুপাতে চাঁদা দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন। আমাদেরকে ছাড় দেওয়া হোক যাতে আমরা যে হারে চাঁদা দিই তাই গ্রহণ করা হয়।

একজন আমেলা সদস্য বলেন, বাড়তে থাকা বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের উপায় কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার একটি বই রয়েছে, 'বৈবাহিক সংক্রান্ত সমস্যাবলী ও এর সমাধান'। বইটি পড়ুন। এর উদ্ধৃতিগুলি বের করে বাড়ি বাড়ি সকলকে দিন। দ্বিতীয় বিষয়টি হল ধৈর্য ও উদ্যম। মহিলা ও পুরুষদের মাঝে ধৈর্যের অভাব রয়েছে। সামান্য বিষয় চরম রূপ ধারণ করে। পুরুষদেরও নম্র ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিত আর অপরদিকে মহিলাদের মধ্যেও সহনশীলতা তৈরী হওয়া উচিত। এর জন্য মাঝে মধ্যে সেক্রেটারী তরবীয়তের দায়িত্ব হল ইসলাহি কমিটি এবং তরবীয়তের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা যাতে পুরুষ ও মহিলারা প্রশিক্ষণ পেতে থাকে। আর আমুরে আমা বিভাগের কাছে কোন কেস তখনই পৌঁছয় যখন তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এর আগে আপনি সেক্রেটারী তরবীয়তকে সক্রিয় করুন। সেক্রেটারী তরবীয়ত ভাল কাজ করলে আপনার কাছে এমন সমস্যা এমনিতেই কমে আসবে এবং এর সমাধানও পেয়ে যাবেন।

এক সদস্য বলেন,এখানে স্কুলগুলিতে ইসলামী শিক্ষাকেও একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যক্রম না থাকার কারণে শিক্ষকরা নিজেদের ইচ্ছে মত ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ নিরীহ শিশুদের শেখাচ্ছেন। যেমন- কুরআন করীমের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং এমন অনেক কিছু।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তো অন্যায় হচ্ছে। আপনারা শিক্ষা বিভাগকে লিখিত জানান যে, আপনারা ভুল পড়াচ্ছেন, এটা ইসলাম নয়। প্রথম সেখানে আপনাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই আপনারা শিক্ষা মন্ত্রালয়ে আপনাদের এতটা প্রভাব অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনারা তাদেরকে লিখিত জানান আর সংবাদ পত্রেও লিখুন যে ছোটদেরকের ইসলামের নামে যা কিছু পড়ানো হচ্ছে তা ভুলভাবে পড়ানো হচ্ছে। ইসলামের প্রকৃত পরিভাষা এটা আর একথা প্রমাণিত যে, কুরআন আজও অক্ষত রয়েছে, নিজের প্রকৃত অবস্থায় রয়েছে। এখন তাদের অনেকের্ই সাক্ষী রয়েছে। বার্মিহামে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল যেখানে তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছে, অন্যান্য স্থানেও নিবন্ধ রচিত হয়েছে, অ-মুসলিদের পক্ষ থেকে, যেটা প্রমাণ করা যায়। আর কুরআন করীমও দাবি করে। তাই আপনাদের চেষ্টা করতে হবে। এরা এমনটি কি কারণে করে? এখন জার্মানীতে তারা চেষ্টা করেছে। যার ফলে তারা তাদেরকে বলেছে, আমরা স্কুলের পাঠ্যক্রম তৈরী করতে যাচ্ছি, তোমরা এ বিষয়ে জানাও। বিভিন্ন ফির্কা নিজের নিজের পাঠ্যক্রম পাঠায়। কিন্তু জামাত আহমদীয়া ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সংবলিত যে পাঠ্যক্রম পাঠিয়েছিল সেটি তারা গ্রহণ করেছে আর সেটিই পড়ানো হচ্ছে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, কোন মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় এতে যোগ করবেন না। আমরা কেবল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা, আকিদা, ধর্মবিশ্বাস, আরকানে ইসলাম, আরকানে ঈমান, কুরআন করীম, আঁ হযরত (সা.)এর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় এবং প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহ এবং প্রমাণসম্মত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তারা সেটি গ্রহণ করেছে। যেখানে অন্য কোন ফির্কার কোন আপত্তি না থাকে আর নির্বিবাদপূর্ণ হয়। এরপর সেটা গ্রহণ করা হয়। এভাবে আপনারাও চেষ্টা করুন। প্রথমত পত্রিকায় লিখুন এবং একাধিক আহমদীর পক্ষ থেকে লেখা হোক যে, যেভাবে পড়ানো হচ্ছে সেটা ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমরা মুসলমান, আমরা জানি ইসলাম কি? আমাদেরকে জিজ্ঞাসা না করে আপনারা কিভাবে নিজের পক্ষ থেকে ইসলাম তৈরী করছেন? এভাবে চেষ্টা করতে হবে, এর জন্য যথারীতি একটি অভিযান শুরু করুন।

সেই সদস্য বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ইনশাআল্লাহ্ এখন পত্রিকাতেও লিখব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পত্রিকায় বার বার লিখুন। এখানে কোলাহলপূর্ণ আন্দোলনের রীতি রয়েছে। হৈ-হট্টগোল করবেন, লিখবেন, ছাত্র ও তাদের মাতাপিতার পক্ষ থেকেও অসংখ্য চিঠি যাবে, এদের যতগুলি মিডিয়া রয়েছে সেখানে লিখবেন, তবেই শিক্ষা বিভাগ চাপে পড়বে।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, তবলীগ সংক্রান্ত বিষয়ে এক ব্যক্তির প্রশ্ন ছিল যে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন তবলীগি যোগাযোগ তৈরী হয়, তখন এদের মিতবাক হওয়ার কারণে যোগাযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করছি যে কিভাবে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে কারা কম কথা বলেন? যার শোনে না কি যারা বলে?

তিনি বলেন, হুযুর! ফিনিশ

জুমআর খুতবা

নিঃসন্দেহে আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি এবং আমরা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছি যে, যে ধর্ম সহ আপনি প্রেরিত হয়েছেন তা সত্য আর এর ভিত্তিতে আমরা আপনার সাথেঅঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমরা আপনার নির্দেশ শোনার ও তা মান্য করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছি। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যেদিকে চান সেদিকেই চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যান এবং নিজে তাতে ঝাঁপ দেন তবে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো। আমাদের মধ্যে একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আমরা এটি অপছন্দ করি না যে, আপনি আগামীকাল আমাদের সাথে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যধারণকারী, শত্রুদের মোকাবিলা করার সময় বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাধ্যমে আপনাকে সেই কার্যসিদ্ধি দেখাবেন যা দেখে আপনার চোখ প্রশান্ত হবে।

হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন আপনার সত্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট এবং আপনার মর্যাদা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন কোনো চুক্তির কোনো গুরুত্বই নেই। সামনে সমুদ্র রয়েছে, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা এতে ঘোড়া সহ ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আর যদি কোনো যুদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনার ডানে লড়ব, বামে লড়ব, সামনে লড়ব এবং পেছনেও লড়ব আর আমাদেরলাশ না মাড়িয়ে আসা পর্যন্ত শত্রু আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না । ”

হে আল্লাহ্! কুরাইশরা অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এসেছে। তুমি আমার সাথে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো, তা পূর্ণ করো আর আজই তাদের ধ্বংস করো।

আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনের প্রেক্ষাপটে বদরের যুদ্ধের পটভূমির বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৩ জুন ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (২৩ এহসান ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যেমনটি গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল, মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত গুপ্তচররা ফেরত এসে মহানবী (সা.)-কে একটি কাফেলা বা সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ প্রদান করে। মহানবী (সা.) যখন এ সংবাদ পান যে, কুরাইশের সেনাবাহিনী (তাদের) বাণিজ্যিক কাফেলার সুরক্ষার জন্য এগিয়ে আসছে, তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান এবং কুরাইশের অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবগত করেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং খুবই চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন, তিনিও খুবই সুন্দর অলোচনা করেন। অতঃপর হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যেদিকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন আপনি সেদিকেই এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। খোদার কসম! আমরা আপনাকে সেই উত্তর দেবো না, যে উত্তর বনী ইসরাঈলীরা হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিল যে, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (সূরা আল মায়েদা: ২৫)অর্থাৎ, যাও! তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা এভাবে বলব যে, আপনি ও আপনার প্রভু যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করব।

সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে বারকুল গিমাদ পর্যন্তও নিয়ে যান, তবুও আমরা আপনার সাথে যাব। বারকুল গিমাদের ব্যাপারে লেখা আছে যে, এটি ইয়েমেনে অবস্থিত ও মক্কা মুকাররমা থেকে পাঁচ মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। আরবদের মাঝে অনেক বেশি দূরত্ব বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহার হতো। আর এরপর তিনি বলেন, আপনার সহযোদ্ধা হয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে থাকব, যতক্ষণ না আপনি সেখানে পৌঁছে যান। মহানবী (সা.) তাকে উত্তম সম্ভাষণে ভূষিত করেন এবং তার জন্য দোয়া করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২০-৪২১) (গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা- আবুল কালাম আজাদ, পৃ: ৩০)

একজন লেখক এটি লিখেছেন যে, বারকুল গিমাদমক্কার দক্ষিণে মোটামুটি প্রায় ৪৩০ কি. মি. দূরত্বে সাধারণ যাতায়াত পথ থেকে দূরের একটি স্থান ছিল,যা পথের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যেমন উর্দূতে বলা হয় 'কোহে কাফ'যা দূরত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করে, অর্থাৎ যতদূর ইচ্ছা চলুন, আমরা আপনার সাথে থাকব। এখানেএকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কতক জীবনীকার এ প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, হযরত মিকদাদ (রা.) এ উপলক্ষ্যে যে আয়াত পাঠ করেছিলেন সেটি সূরা মায়েদার আয়াত আর এই সূরা অনেক পরে অবতীর্ণ হওয়া সূরা। তাই সে সময় এই আয়াত পাঠ করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত বিষয় নয়। কিন্তু এরপর এই তফসীরকারকগণ নিজেরাই এসংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। যেমন- হতে পারে তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে অর্থাৎ ইহুদীদেরকাছে এ কথা শুনে থাকবেন অথবা হতে পারে পরবর্তীতে কোনো বর্ণনাকারী উক্ত আয়াত এতে অর্ন্তভুক্ত করে থাকবে।

(দায়েরায়ে মারুফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

যাহোক, এই আপত্তি ততটা গুরুত্ব রাখে না, কেননা জীবনচরিতের গ্রন্থাবলীতে অগণিত স্থানে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু বুখারী শরীফের তফসীর ফাতহুল বারী, যা ইবনে রজবএর ব্যাখ্যা, তাতে একথা লেখা আছে যে, একথা সঠিক নয় যে সম্পূর্ণ সূরা মায়েদা বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এর কতক আয়াত বেশ পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সেগুলোর মধ্য থেকেই একটি আয়াত হযরত মিকদাদ (রা.) বদরের যুদ্ধের সময় পাঠ করেছিলেন। কিন্তু যাহোক, ইহুদীদের কাছ থেকেই শুনেছিলেন- একথাটিও সঠিক হতে পারে।

অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, এই তিনজন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.),হযরত উমর (রা.) এবং হযরত মিকদাদ (রা.) মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কারণে মহানবী (সা.) আনসারের মতামত জানতে চাচ্ছিলেন।

(আর রাহীকুল মাখতুম, প্রণেতা- মৌলানা সফিউর রহমান, মুবারকপুরী, পৃ: ২৮৫) (ফতহুল বারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১)

অতএব মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকেরা! আমাকে পরামর্শ দাও। তিনি (সা.) আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। আর হয়ত এরকারণ এটিও হতে পারে যে, আকাবার বয়আতের সময় তারা নিবেদন করেছিল যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিঃসন্দেহে আমরা সে সময় পর্যন্ত আপনার বিষয়ে দায়মুক্ত যতক্ষণ আপনি আমাদের শহরে আগমন না করছেন, কিন্তু যখনই আপনি সেখানে অর্থাৎ মদীনায় আসবেন তখন আপনার দায়িত্ব আমাদের ওপর থাকবে। আমরা প্র ত্যেক সেই জিনিস দ্বারা আপনার সুরক্ষা করব যা থেকে আমরা নিজেদের স্ত্রীসন্তানদের সুরক্ষা করে থাকি। এ কারণে মহানবী (সা.) এই আশঙ্কা করছিলেন যে, আনসাররা কোথাও আবার এটি মনে করছে না তো যে, তারা কেবল সেসবশত্রু থেকে তাঁর (সা.) সুরক্ষা করবে যারা মদীনা শরীফের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করবে আর হয়ত একথা ভাবছে যে, তাদের জন্য নিজেদের শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন একথা বলেন তখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) তাঁর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আপনি আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। মহানবী (সা.) বলেন, অবশ্যই। তখন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি এবং আমরা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছি যে, যে ধর্ম সহ আপনি প্রেরিত হয়েছেন তা সত্য আর এর ভিত্তিতে আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমরা আপনার নির্দেশ শোনার ও তা মান্য করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছি। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যেদিকে চান সেদিকেই চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যান এবং নিজে তাতে ঝাঁপ দেন তবে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো। আমাদের মধ্যে একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আমরা এটি অপছন্দ করি না যে, আপনি আগামীকাল আমাদের সাথে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যধারণকারী, শত্রুদের মোকাবিলা করার সময় বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাধ্যমে আপনাকে সেই কার্যসিদ্ধি দেখাবেন যা দেখে আপনার চোখ প্রশান্ত হবে। অতএব ঐশী কল্যাণে সিক্ত হয়ে আপনি আমাদের নিয়ে যাত্রা করুন।

সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে এ শব্দগুলো হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র প্রতি আরোপিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাই জীবনীকাররা এভাবে এটির সমন্বয় করেছেন যে, হতে পারে দু'বার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করা হয়ে থাকবে। প্রথমবার যখন মদীনায় তিনি (সা.) কাফেলার সংবাদ পান তখন, সেখানে হযরত উবাদাহা (রা.) এই বক্তব্য দিয়ে থাকবেন, আর দ্বিতীয়বার যখন তিনি (সা.) সফরে ছিলেন তখন পরামর্শ চাইলে সে সময় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) একথা বলে থাকবেন। যাহোক, এটি তো তফসীর যাতে বিভিন্ন ভাষ্যকার নিজ নিজ মন্তব্য লিখেছেন, কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, সা'দ বিন মুআয (রা.) একথা বলেছেন। হযরত সা'দ (রা.)'র একথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন, যাত্রা করো এবং তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দু'টি দলের মাঝে একটি দলের ওপর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খোদার কসম! আমি যেন এ মুহূর্তেই সেসব স্থান দেখতে পাচ্ছি যেখানে শত্রুপক্ষের লাশ পড়বে।

(আসসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ:-৪২১) (শারাহ যিরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭০)

তাঁর (সা.) একথা শুনে সাহাবীরা আনন্দিত হন, কিন্তু একই সাথে তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, هَلَّا ذَكَرْتَ لَنَا الْقِتَالَ فَنَسْتَعِدَّ (উচ্চারণ:হাল্লা যাকারতা লানাল কিতালা ফানাসতাঈদ)অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে পূর্বেই জানতেন তাহলে আপনি আমাদেরকে মদীনাতেই যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে কেন অবগত করেননি, তাহলে আমরা কিছুটা প্র স্তুতি গ্রহণ করে বের হতে পারতাম। কিন্তু এ সংবাদ ও এই পরামর্শ সত্ত্বেও এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই দু'দলের মধ্য হতে কোনো একটি (দলের) ওপর মুসলমানদের অবশ্যই বিজয়ী হওয়া মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও কোন্ দলের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে তা তখনো অবধি নিশ্চিত ছিল না। তবে, তারা এই দুই দলের মধ্য হতে কোনো একটি দলের সাথে লড়াই হবার সম্ভাবনার কথা জানতো। আর স্বভাবতই দুর্বল দলের অর্থাৎ কাফেলার সাথে লড়াইয়ের বেশি আকাঙ্ক্ষী ছিল।

(সীরাতুন্নবী, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. পৃ: ৩৫৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়ে বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় যখন মদীনার বাহিরে যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) সকল সাহাবীকে একত্রিত করে বলেন, হে লোকেরা! আমাকে পরামর্শ দাও কেননা আমি জানতে পেরেছি কাফেলার সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে না বরং মক্কার সৈন্যবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। তখন একের পর এক মুহাজির দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি যুদ্ধ করুন আমরা আপনার সাথে আছি। কিন্তু প্রতি বারেই কোনো মুহাজির দাঁড়িয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বসে গেলে মহানবী (সা.) বলতেন, হে লোকেরা আমাকে আরো পরামর্শ দাও। তাঁর (সা.) মাথায় এ বিষয়টি ছিল যে, মুহাজিররা পরামর্শ তো দিচ্ছেই মূল বিষয় হচ্ছে আনসারদের। আনসারদের নীরব থাকার কারণ হলো তাদের এই ধারণা যে, (বিপক্ষ) যোদ্ধারা হলো মক্কার মানুষ (তাই) তারা আমরা যদি মক্কার মানুষের সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বলি তাহলে সম্ভবত আমাদের এই কথা মুহাজিরদের পছন্দ হবে না। আর তারা (হয়তো) ভাববে, এসব লোকেরা আমাদের ভাই-বন্ধুদের হত্যা করার জন্য উৎসাহী হয়ে কথা বলছে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন বার বার বলেন, হে লোকেরা আমাকে পরামর্শ দাও, তখন এক আনসারসাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো পরামর্শ পাচ্ছেন। একের পর এক মুহাজির দাঁড়াচ্ছেন এবং তারা বলছেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল যুদ্ধ করুন! কিন্তু আপনি বার বার বলছেন যে, হে লোকেরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি মনে করি সম্ভবত, আপনি আনসারের পরামর্শ চাচ্ছেন। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক বলেছ। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের নীরব থাকার কারণ হলো, আমাদের এ আশঙ্কা যে, কোথাও আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা না আবার মনে কষ্ট পান আর আমরা যদি বলি আমরা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত তাহলে পাছে তাদের হৃদয়ে এই ধারণা জন্মে যে, এরা আমাদের ভাই এবং আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সম্ভবত আপনি আকাবার সেই বয়আতের দিকে ইঙ্গিত করছেন; যখন আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, মদীনার ওপর যদিকোনো শত্রু আক্রমণ করে তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করব। কিন্তু যদি মদীনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমাদের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক, এটিই আসল কথা। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যখন সেই অঙ্গীকার করেছিলাম তখন আমরা আপনার মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথরূপে অবগত ছিলাম না। হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন আপনার সত্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট এবং আপনার মর্যাদা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন কোনো চুক্তির কোনো গুরুত্বই নেই। সামনে সমুদ্র রয়েছে, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা এতে ঘোড়া সহ ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আর যদি কোনো যুদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনার ডানে লড়ব, বামে লড়ব, সামনে লড়ব এবং পেছনেও লড়ব আর আমাদের লাশ না মাড়িয়ে আসা পর্যন্ত শত্রু আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না । "

(সেইরে রূহানী নম্বর-৪, আনোয়ারুল উলুম,খন্ড-১৯,পৃ: ৫৩২-৫৩৩)

এই পরামর্শের পর মহানবী (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং বিভিন্ন পথ পাড়ি দিয়ে বদরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন।

বদর সম্পর্কে বিস্তারিত পূর্বেই বর্ণনা হয়েছে কিন্তু (এখানেও) বলে দিচ্ছি যে, মদীনার দক্ষিণ পশ্চিমে একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে এটি অবস্থিত। এটি ডিম্বাকৃতির সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ এবং চার মাইল প্রস্থের বিস্তৃত মরুপ্রান্তর। যার চতুষ্পার্শ্বে উঁচু পাহাড় রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি কূপ এবং বাগানও ছিল, যেখানে সাধারণত বিভিন্ন কাফেলা যাত্রা বিরতি করতো। বদরের নিকটে শিবির স্থাপন করার কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) বাহনে চড়ে বের হন এবং একজন আরব বৃদ্ধের নিকট গিয়ে থামেন এবং তার কাছে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে কুরাইশ (দল) এবং মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সেই বৃদ্ধ বলে, আমি তোমাকে তখনই বলব যখন তোমরা আমাকে একথা বলবে যে, তোমরা কোন্ গোত্রের সদস্য? মহানবী (সা.) বলেন, যখন তুমি আমাদেরকে বলবে তখন আমরাও তোমাকে আমাদের সম্পর্কে অবগত করব; নিজেদের সম্পর্কে বলব। সে বলে, তথ্যের বিনিময়ে তথ্য দেবে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। (তখন) বৃদ্ধ বলে, আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা অমুক অমুক দিন রওয়ানা হয়েছেন। যদি আমাকে সংবাদদাতা সত্য বলে থাকে তবে তারা আজ অমুক স্থানে থাকবে। সে সেই স্থানের নাম বলে যেখানে মহানবী (সা.) পৌঁছেছিলেন। এরপর (সে) আরো বলে, আমি এটিও জানতে পেরেছি যে, কুরাইশরা অমুক দিন রওয়ানা হয়েছে। যদি আমাকে সংবাদ প্রদানকারী সত্য কথা বলে থাকে তবে আজ তারা অমুক স্থানে আছে। সে সেই স্থানের নাম উল্লেখ করে যেখানে কুরাইশরা পৌঁছেছিল। উভয় কথাই সে সঠিক বলেছিল। যখন সে তার সংবাদ দেওয়া শেষ করে তখন সে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোত্থেকে?

মহানবী (সা.) বলেন, আমরা পানি থেকে। এরপর মহানবী (সা.) তার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সে বলে, পানি হতে! এর অর্থ কী? (তোমরা) কি ইরাকের পানি হতে? তিনি (সা.)-এর এই উত্তর,বহুমুখী মনে হয়। এ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ কথা বলেছেন। আমাদের যারা উদ্ধৃতি খুঁজে বের করেন তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন (যার) সারমর্ম বলে দিচ্ছি। ঐতিহাসিকগণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, বাহ্যত মনে হয়, মহানবী

(সা.) কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক উত্তর প্রদান করেন নি। লেখকরা এর উত্তর প্রদান এভাবে প্রদান করে থাকেন যে, মহানবী (সা.) তাকে ভুল উত্তর দেন নি। তবে হ্যাঁ, তিনি (সা.) এর বহু অর্থবোধক উত্তর প্রদান করেছেন যা মিথ্যাও নয় এবং সেই বিরাজমান ভয়ংকর যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট স্থানের কথাও বলেন নি। কেননা মহানবী (সা.)-এর উক্তি 'আমরা পানি হতে' বলতে কুরআনের সেই ভাষ্য অর্থাৎ, 'আমরা প্র ত্যেক জীবিত বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি'-বুঝিয়েছেন। একজন জীবনীকার আবু বকর জাবের আল্ জাযায়েরী একথা লিখেছেন । একজন বলেন, আরবের রীতি এটি ছিল যে, যেখানে মানুষ বসবাস করতো সেস্থানের ঠিকানা সেখানকার পানি অর্থাৎ ঝরনা ইত্যাদির নামের বরাতে বলতো। অর্থাৎ আমরা অমুক পানি অথবা অমুক অঞ্চলের পানির সাথে সম্পর্ক রাখি। আল্লামা বুরহান হালাবী এটি লিখেছেন। আরেকটি ব্যাখ্যা এটিও হতে পারে যে, তিনি (সা.) বদরের সেই ঝরনার নাম-ই বলেছিলেন যার নিকটে তিনি (সা.) অবস্থান করছিলেন, যেমনটি সেই বৃদ্ধ বলেছিল। কিন্তু হয়তো এমনভাবে ইঙ্গিত করে থাকবেন যে, সেই বৃদ্ধ ইরাকের দিকে মনে করেছিল আর বদরের সেই ঝরনা এবং ইরাক (হয়তো) একই দিকে ছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন।

এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে ফেরত আসেন। এরপর সন্ধ্যা নেমে এলে মহানবী(সা.) হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে আরো কয়েকজন সাহাবীর সাথে বদরের ঝরনা অভিমুখে প্রে রণ করেন যেন তাঁরা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। (সেখানে) তাঁরা কুরাইশের জন্য পানি বহনকারী দু'জন ক্রীতদাসের দেখা পান। সাহাবীরা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন মহানবী (সা.) নামায পড়ছিলেন। তারা উভয়ে বলে, আমরা কুরাইশের জন্য পানি বহনকারী। তারা আমাদেরকে পানি নেয়ার জন্য পাঠিয়েছে। সাহাবীরা তাদের কথা বিশ্বাস করেন নি, এবং ধারণা করেন; এরা সম্ভবত আবু সুফিয়ানের কর্মচারী। তাই সাহবীরা তাদেরকে মারধর করেন। যখন তাদেরকে কঠিন প্রশ্নবানে জর্জরিত করেন তখন তারা বলে বসে যে, আমরা আবু সুফিয়ানের কর্মচারী, কেবল তবেই সাহাবীরা তাদেরকে (মারধর) বন্ধ করেন। সালাম ফেরানোর পর মহানবী (সা.) বলেন, যখন তারা উভয়ে তোমাদেরকে সত্য বলেছে তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করেছ আর যখন তারা মিথ্যা বলেছে তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ। খোদার কসম! তারা সত্য বলেছে। তারা যে কুরাইশের ক্রীতদাস এতে কোনো সন্দেহ নেই।এরপর তিনি তাদের উভয়ের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা আমাকে কুরাইশ সম্পর্কে বলো। তারা উভয়ে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! তারা এই টিলার পেছনে উপত্যকার অপর প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছে। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা সংখ্যায় কত? তারা উত্তরে বলে, অনেক। জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের সংখ্যা কত? তারা বলে, আমরা জানি না। তিনি (সা.) বলেন, তারা খাওয়ার জন্য দৈনিক কতটি উট জবাই করে। তারা উত্তরে বলে, কোনো দিন নয়টি আবার কোনো দিন দশটি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তারা নয়শ' থেকে একহাজার হবে। তিনি (সা.) উট জবাই করে খাওয়ার হিসাব থেকে অনুমান করেছেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তাদের মাঝে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয়দের কে কে আছে? তারা কুরাইশের বেশ কয়েকজন নেতার নাম বলে যাদের মধ্যে আবু জাহল, উতবা, শায়বা, হাকীম বিন হিযাম এবং উমাইয়্যা বিন খালাফ প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর মহানবী (সা.) উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, هٰذَا مَكَّةُ قَدْ اَلْقَتْ اِلَيْكُمْ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا (উচ্চারণ: হাযিহি মাক্কাতু কাদ আলকাত ইলাইকুম আফলাযা আকবাদেহা অর্থাৎ মক্কা তোমাদের সামনে তাদের কলিজার টুকরা বের করে রেখে দিয়েছে।

(আসসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ:-৪২১-৪২২) (শারাহ যিরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭০) (এটলাস সীরাতে নববী, পৃ: ২১৬) (সীরাত হাবীবে দো আলাম, প্রণেতা-আবু বকর জাবের, উর্দু অনুবাদ- পৃ: ১৮৫) (গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা-আল্লামা বুরহান হালবী, উর্দু অনুবাদ-পৃ: ৮১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব(রা.)ও এ প্রসঙ্গে নোট লিখেছেন, মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, هٰذَا مَكَّةُ قَدْ اَلْقَتْ اِلَيْكُمْ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا (হাযিহি মাক্কাতু কাদ আলকাত ইলাইকুম আফলাযা কাবাদেহা) অর্থাৎ দেখো! মক্কা তোমাদের সামনে তাদের কলিজার টুকরা বের করে রেখে দিয়েছে। এটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য ছিল যা মহানবীর পবিত্র মুখ থেকে অবলীলায় বেরিয়েছে। কেননা, কুরাইশের এতসংখ্যক নামীদামী নেতৃবৃন্দের উল্লেখ করা হলে দুর্বল প্রকৃতির মুসলমানরা মনোবল হারাতে পারত- তা না হয়ে এ বাক্য তাদের চিন্তাচেতনার প্রবাহএদিকে পরিচালিত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন এসব কুরাইশ নেতাকে মুসলমানদের শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। "

(সীরাতুন্নবী, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. পৃ: ৩৫৬)

এরপর মহানবী (সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন যেন মুশরিকদের পূর্বেই বদরের ঝরনায় পৌঁছে যেতে পারেন, মুশরিকরা যেন তা দখল করতে না পারে। যাহোক, এশার নামাযের সময় তিনি বদরের নিকটবর্তী ঝরনার কাছে অবস্থান নেন।

(আর রাহীকুল মাখতুম, প্রণেতা- মৌলানা সফিউর রহমান, মুবারকপুরী, পৃ: ২৮৮)

এপর্যায়ে হযরত হুবাব বিন মুনযের একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখন বদরের নিকটবর্তী ঝরনার পাশে শিবির স্থাপন করেন তখন হুবাব বিন মুনযের (রা.) নিবেদন করেন, হেআল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ জায়গায় শিবির স্থাপন করেছেন? অর্থাৎযদি তাই হয় তাহলে আমরা এরচেয়ে সামনেও যেতে পারবো না আর এরচেয়ে পেছনেও যেতে পারবো না- নাকি এটি নিছক আপনার মত এবং রণকৌশল মাত্র। হুযূর (সা.) বলেন, এটি নিছক (আমার)নিজস্ব মত আর রণকৌশল মাত্র। তখন হযরত হুবাব (রা.) নিবেদন করেন, এটি উপযুক্ত জায়গা নয় বরং আপনি লোকদেরকে এখান থেকে সরিয়ে সেস্থানে শিবির স্থাপন করুন যা শত্রুদের তুলনায় ঝরনার সবচেয়ে নিকটতম স্থান হবে। এছাড়া অন্য সব কূপ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং নিজেদের জন্য একটি চৌবাচ্চা বানিয়ে তা পানি দিয়ে ভরে রাখা হোক। এরপর আমরা যদি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি তাহলে পান করার জন্য আমাদের কাছে পানি থাকবে আর শত্রুরা পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার পরামর্শ খুবই উত্তম। এরপর তিনি (সা.) সৈন্যদের নিয়ে ঝরনায় আসেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন যা কুরাইশের চেয়ে ঝরনার নিকটতর ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে অন্য কূপগুলো অকার্যকর করে দেয়া হয়। আর যে কূপের কাছে শিবির স্থাপন করা হয় সেখানেএকটি চৌবাচ্চা বানিয়ে তা পানি দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। এ বিবরণ সীরাত ইবনে হিশামে রয়েছে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ:৪২১)

স্থান নির্বাচনের পর মহানবী (সা.)-এর অবস্থানস্থল প্রস্তুত করার কাজ ছিল। অতএব অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শে সাহাবীরা ময়দানের এক প্রান্তে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি আপনার অবস্থানের জন্য একটি ছাউনী তৈরী করবো?

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৩)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যে বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন করেছেন তা পূর্বেও একবার বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এখানেওবর্ণনা করা আবশ্যক। অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শে সাহাবীরা ময়দানের এক প্রান্তে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনি তৈরী করেন এবং হযরত সা'দ মহানবী (সা.)-এর বাহন ছাউনির পাশে বেঁধে রেখে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই ছাউনিতে অবস্থান করুন আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করতে যাই। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয় দান করেন তাহলে এটিই আমাদের কাম্য। কিন্তু আল্লাহ্ না করুক যদি পরিস্থিতি ভিন্ন হয় আর আমরা পরাজিত হই তাহলে আপনি আপনার বাহনে চড়ে যেভাবেই হোক মদীনায় পৌঁছে যাবেন। সেখানে আমাদের এমন ভাইবন্ধু রয়েছেন যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আমাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। কিন্তু তারা যেহেতু জানে না, এই অভিযানে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তাই তারা আমাদের সাথে আসেনি, তা নাহলে তারা কখনো পেছনে থাকতো না। কিন্তু যখন তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবে তখন তারা আপনার নিরাপত্তায় নিজেদের জীবনবাজি রাখতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। এটি হযরত সা'দ (রা.)'র আন্তরিকতার আতিশয্য যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।কিন্তু কেউ খোদা তা'লার রসূল হবেন আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন এটি কীভাবে সম্ভব! যেমন হুনায়নের রণক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, মুসলমানদের বারো হাজার সৈন্যবিশিষ্ট সেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেও তৌহীদের প্রাণকেন্দ্র মহানবী (সা.) দোদুল্যমান হননি। যাহোক, একটি ছাউনি তৈরী করা হয়। হযরত সা'দ (রা.) এবং অন্যান্য আনসার সাহাবীগণ তার চতুষ্পার্শ্বে পাহারা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। মহানবী(সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এই ছাউনিতেই রাত্রিযাপন করেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) এই ছাউনিতেই নগ্ন তরবারি হাতে মহানবী (সা.)-এরনিরাপত্তার জন্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন আর মহানবী (সা.) সারা রাত আল্লাহ্ তা'লার সকাশে ক্রন্দন ও আহাজারি করে দোয়া করতে থাকেন। এটিও লেখা হয়েছে যে, পুরো সেনাবাহিনীতে কেবলমাত্র তিনি (সা.)ই সারা রাত জেগে কাটান আর অন্য সবাই পালাক্রমে কিছুটা হলেও ঘুমিয়ে নেয়।"

(সীরাতুন্নবী, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. পৃ: ৩৫৭) (সুবুলুল হুদা, খণ্ড- ১১, পৃ: ৩৯৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, 'বদরের প্রান্তরে পৌঁছালে সাহাবীরা একটি উঁচু জায়গা বানিয়ে মহানবী (সা.)-কে সেখানে

বসান। এরপর তারা পরস্পর পরামর্শ করেন যে, সবচেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন উটনি কার কাছে রয়েছে? এরপর সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন একটি উটনী নিয়ে তাঁরা মহানবী (সা.)-এর আবাসনের নিকটে বেঁধে রাখেন। মহানবী (সা.) সেটিকে দেখার পর বলেন এটি এখানে কেন? উত্তরে তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সংখ্যায় অল্প আর শত্রুরা সংখ্যায় বেশি। আমাদের আশঙ্কা হয়, পাছে আমরা সবাই এখানে শহীদ হয়ে যাই! হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আমাদের মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত নই বরং আমাদের চিন্তা আপনাকে নিয়ে, পাছে আপনার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। আমরা মারা গেলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আপনার সাথে ইসলামের জীবনের সম্পর্ক। তাই আপনার নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার নিরাপত্তার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিযুক্ত করেছি আর এই যে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি উটনি, যা আপনার কাছে বেঁধে রেখেছি। আল্লাহ্ না করুন, যদি আমাদের একের পর এক এখানে মারা যাওয়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই উটনিটি এখানে রইল এটিতে চড়ে আপনি মদীনায় পৌঁছে যাবেন।

সেখানে আমাদের ভাইয়েরা আছে। তারা একথা জানতো না যে যুদ্ধ হতে পারে, যদি তারা জানতো তাহলে তারাও আমাদের সাথে যোগদান করতো। আপনি তাদের কাছে পৌঁছে যাবেন; তারা আপনার নিরাপত্তা বিধান করবে আর আপনি শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবেন।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ২৪৪-২৪৫)

কিন্তু যাহোক, মহানবী (সা.) তো তাদের একথা মানার ছিলেন না আর তিনি (সা.) এটি মানতেও পারতেন না। তবে, এটি ছিল সেসব সাহাবীর আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "হযরত আলী (রা.) একবার বলেন, সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীর ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। বদরের যুদ্ধের সময় যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য একটি পৃথক তাঁবু (উচু স্থানে) নির্মাণ করা হয় তখন এই প্রশ্ন সামনে আসে যে, আজকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা যায়? তখন হযরত আবু বকর(রা.) তৎক্ষণাৎ নগ্ন তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং তিনি এই চরম বিপদের সময় পরম সাহসিকতার সাথে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। "

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪-৩৬৫)

যাহোক ভোরবেলা কুরাইশরা নিজেদের অবস্থানস্থল ছেড়ে এগিয়ে আসে। মহানবী (সা.) তাদেরকে দেখে বলেন, হে আল্লাহ্! কুরাইশরা অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এসেছে। তুমি আমার সাথে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো, তা পূর্ণ করো আর আজই তাদের ধ্বংস করো।

মুশরিকদের মাঝে মহানবী (সা.) উতবা বিন রাবিআকে একটি লাল বর্ণের উটে আরোহিত দেখতে পান। তিনি (সা.) বলেন, যদি তাদের কারো মাঝে মঙ্গল থেকে থাকে তাহলে কেবল এই লাল উষ্ট্রারোহীর কাছেই রয়েছে। তারা যদি তার কথা শুনে তাহলে সঠিক পথে চলে আসবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চৌবাচ্চা থেকে কাফেরদের পানি পান করার ঘটনা পাওয়া যায়। যদিও পানির ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিন্তু কুরাইশরা যখনবদরের প্রান্তরে অবস্থান নেয় তখন তাদের মাঝ থেকে এক দল মহানবী (সা.)-এর জলাধারে এসে পানি পান করতে থাকে। এদের মাঝে হাকীম বিন হিযামও ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এদেরকে পানি পান করতে দাও। সেদিন এ জলাধার থেকে যারাই পানি পান করেছিল তাদের সবাই নিহত হয় শুধু হাকীম বিন হিযাম ছাড়া। হাকীম বিন হিযাম পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে যখন শপথ নিত তখন এভাবে বলতো যে, সেই সত্তার কসম, যিনি বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৪)

যুদ্ধের জন্য সারি বিন্যস্ত করা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, ভোরবেলা কুরাইশদের আসার পূর্বে তিনি (সা.) সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন। তিনি (সা.) তিরের মাধ্যমে সারি বিন্যস্ত করছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে ইশারা করছিলেন (আর বলছিলেন)সামনে আসো, পেছনে যাও, যতক্ষণ না সারি সোজা হয়। তিনি (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে (রা.) পতাকা প্রদান করেন যা তিনি সেই স্থানে রাখেন যেখানে রাখার নির্দেশ তিনি (সা.) দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) সারিগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তখন পশ্চিমমুখি ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা, ৪র্থখণ্ড, পৃ: ৩৩)

এইপুরো সময়ে, অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন সারিবিন্যস্ত করছিলেন তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটি হযরত সুওয়াদ বিন গাযইয়া (রা.)-এর ঘটনা, যার মাধ্যমে রসূলপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইতিহাসে লেখা আছে যে, বদরের যুদ্ধে সারি ঠিক করার সময় যখন মহানবী (সা.) সুওয়াদ বিন গাযইয়া (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি সারির বাইরে ছিলেন। তিনি (সা.) তার পেটে তীর লাগিয়ে ইশারা করেন আর বলেন হে সুওয়াদ! সোজা হয়ে দাঁড়াও। হযরত সুওয়াদ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। আপনাকে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়বিচারের সাথে প্রেরণ করেছেন। আপনি আমার পেটে তির মেরেছেন, আপনি আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন। মহানবী (সা.) নিজের পেট থেকে কাপড় সরান আর বলেন, প্রতিশোধ নাও। হযরত সুওয়াদ (রা.) তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর শরীরে চুমু খেতে থাকেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে সোয়াদ! তুমি কেন এমনটি করলে? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কী (ভয়াবহ) এক অবস্থা বিরাজ করছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্র, জানি না আমি বেঁচে থাকব কি না। আমি চাইলাম, আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলো এমন অবস্থায় অতিবাহিত হোক যখন আমার দেহ আপনার পবিত্র দেহকে স্পর্শ করবে। মহানবী (সা.) তাঁর কল্যাণের জন্য দোয়া করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২০-২২১)

এই ছিল ভালোবাসা ও প্রেমের (নয়নাভিরাম) দৃশ্য।

বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

এখন কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের মাঝে একজন হলেন, মুকাররম ক্বারী মুহাম্মদ আশেক সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়ার সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন এবং মাদরাসাতুল হিফজ-এর নিগরান ও প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে ৮৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। ক্বারী আশেক সাহেব পবিত্র কুরআন হিফজ এবং তাজবীদ শেখার পর (আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে) পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আহলে হাদীসের মাদরাসায় পঠন-পাঠনের সুযোগ পান। তিনি নিজেই বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। ক্বারী আশেক সাহেব বয়আত গ্রহণের পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ক্বারী সাহেব আত্মজীবনী পুস্তিকায় লিখিয়েছিলেন যে, ১৯৫৭ সালের ঘটনা, আমি যখন করাচীতে ছিলাম তখন সেখানকার কতক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আমার ওঠাবসা ছিল। আমি অধিকাংশ সময় তাদের কাছে চলে যেতাম। সেখানে পত্রিকা পড়তাম আর কতক আলেমের সাথে বৈঠকও হতো। একদিন আমি সেখানে বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। তখন এক বন্ধু যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোনো বই অধ্যয়ন করছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, কী চমৎকার! আমি বললাম, চমৎকার কী? তখন তিনি বললেন, আমাদের সম্মানিত আলেমরা কুরআনের কতিপয় আয়াতের নাসেখ-মনসুখ হওয়ায় বিশ্বাসী, অথচ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব বলে যে, কুরআনের এক বিন্দু-বিসর্গও মনসুখ নয়। ক্বারী সাহেব বলেন, একথায় আমি অনুসন্ধানিৎসু হয়ে পড়ি। আমি ভাবলাম, এ বিষয়টি গবেষণা করে দেখা যাক যে, তিনি কি সত্য নাকি মিথ্যা। এরপর তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়েছেন যে, একদিন আমি আহমদীয়াতের বিষয়ে জানার জন্য নামাযের পর করাচীর আহমদীয়া হলে গেলাম এবং সেখানে এক আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে বললাম, 'এখতেলাফী মাসায়েল' (তথা বিতর্কিত বিষয়ে) কিছু জানতে চাই, এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করা হোক। সেখানে বসে থাকা এক ব্যক্তি আমাকে আহমদীয়া হল থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি আমাকে কিছু বইপত্র পড়তে দেন। আমি সেগুলো পড়ি আর আমার সেই জ্ঞানী বন্ধুদের মাঝ থেকে এক মৌলভী সাহেবকে দেখাই যে, এটিই তো প্রকৃত ইসলাম। মৌলবি সাহেব বলেন, আপনি খুব ভদ্র ও সরল মানুষ। আপনার হয়ত জানা নেই, তাই আমি আপনাকে বলছি, মির্যা সাহেবের ছোট ছোট পুস্তিকায় যেসব আকিদা লেখা আছে তা ইসলামসম্মত। এগুলো সেসব কিতাবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত যা তিনি প্রাথমিক যুগে লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব বড় বড় পুস্তক লিখেছেন সেগুলোতে মির্যা সাহেব মিথ্যা ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাস লিখে রেখেছেন। [অথচ বারাহীনে আহমদীয়া তো প্রারম্ভিক যুগেই লেখা হয়েছিল আর সেটিই ছিল ইসলামের মূল আর পরবর্তীতেও তিনি বিভিন্ন বইপুস্তক লিখেছেন]। যাহোক ক্বারী সাহেবের সাথে যার সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, ক্বারী সাহেব পুনরায় তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আমাকে কোনো বড় পুস্তক দিন। কিন্তু তিনি বড় পুস্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অযুহাত দেখান অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকগুলোতে কোনো স্ববিরোধ নেই; তা প্রাথমিক যুগের পুস্ত ক হোক আর শেষের দিকের বা পরবর্তীতে লেখা কোনো পুস্তকই হোক। সেই আহমদী কোন্ প্রজ্ঞার অধীনে তাকে

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

(তথা ক্বারী সাহেবকে বড় পুস্তক) দেননি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু যাহোক, তার সাথে ক্বারী সাহেবের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ক্বারী সাহেবের আত্মজীবনী অনুযায়ী জানা যায়, ঐশী তকদীর তাঁর হৃদয়ে একপ্রকার বিশেষ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল এবং কারী সাহেব অসংখ্যবার রাবওয়া আসতে থাকেন আর স্থানীয় আহমদী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং অনেক দোয়াও অব্যাহত রাখেন। এসব দোয়ার মাঝেই তিনি বেশ কয়েকটি স্বপ্নও দেখেন। এসব স্বপ্নের মাঝে একটি স্বপ্ন ছিল "ইসমাউ সাওতাস সামা' জাআল মসীহ্"। অর্থাৎ আকাশবাণী শুনো, মসীহ্ এসে গেছেন। ক্বারী সাহেব বলেন, তখন এসব বাক্যের মাধ্যমে আহমদীয়াতের দিকে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু আহমদী হওয়ার পর স্মরণ হয় যে, আমার সেই স্বপ্ন তো পূর্ণ হয়েছে! তিনি বিভিন্ন স্বপ্ন দেখেছিলেন সেগুলোর মাঝে এটিও একটি স্বপ্ন ছিল। ক্বারী সাহেব লেখেন, আমি যখন আমার জীবনের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দিই তখন আমি ভাবি যে, এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ছিল যে, আমার মনোযোগ বারবার আহমদীয়াতের প্রতি নিবদ্ধ হতে থাকে আর অবশেষে আমি হেদায়েত পাই।

তিনি আরও লেখেন, আনসারুল্লাহ্র ইজতেমায় লাহোরের মুরব্বী সিলসিলাহ শেখ আব্দুল কাদের সাহেব সওদাগরমল-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইজতেমার প্রথম দিন আনসারুল্লাহ্র ইজতেমায় যাই (তখনও তিনি বয়আত গ্রহণ করেননি)। প্রথম দিনের সকল অনুষ্ঠান দেখি। ইজতেমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আমি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি যে, আমার বয়আত নেওয়া হোক। এরপর আমি কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ দফতরে যাই আর বয়আত ফর্ম পূরণ করে আহমদীয়াতের নূরে নূরান্বিত হই।

(মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ১১-২২)

আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর তাকে বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। অন্যদিকে তার অ-আহমদী শিষ্য এবং নেতাদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে তাকে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করা হয়, বিভিন্ন প্রলোভনও দেখানো হয়, অনেক কঠোরতাও প্রদর্শন করা হয়। ক্বারী সাহেব বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর আমার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (আহমদীয়াতে) অবিচল রাখেন এবং আমি তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে থাকি। আল্লাহ্ তা'লার পথনির্দেশ আমার সহায় ছিলতাই জাগতিক কোনো প্রলোভন আমাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আহমদীয়া মুসলিমজামা'তের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং পুনরায় আহলে হাদীসের মাঝে ফেরত নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঈমানের যে রঙেআমি রঙিন হয়েছিলাম এর ফলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা আমাকে ফেরত নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। "

(মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ২৭)

এক বিধবার সাথে তার বিবাহ হয় যিনি পূর্বেই তিন সন্তানের জননী ছিলেন। তার ঔরসে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

জামা'তী সেবামূলক কর্ম কাণ্ড সম্পর্কে তিনি লেখেন, সূফী খোদা বখশ যিরভি সাহেবের সাথে একদিন মসজিদে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন,হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের (যিনি সে-সময় ওয়াকফে জাদীদের ইনচার্য ছিলেন) পয়গাম হলো, আপনাকে যেন রাবওয়াতে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। (তখন তিনি বয়আতকৃতই ছিলেন)। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সমীপে উপস্থিত হই তখন মিয়া সাহেব প্রথমে আমার তিলাওয়াত শোনেন এরপর ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম সাহেবদেরকে তাজবীদসহ কুরআন পড়ানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দেন এবং ওয়াকফে জাদীদ দফতরেই থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। এটি ১৯৬৪ সালের ঘটনা। ১৯৬৫ সালের ০১ জানুয়ারি ক্বারী সাহেবের ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম হিসেবে নিযুক্তি হয়। একইভাবে জামেয়া আহমদীয়ার শাহেদ ক্লাসের ছাত্ররা তার কাছে পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য ওয়াকফে জাদীদ দফতরে আসতো। আর পরবর্তীতে জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল মোহতরম মীর দাউদ সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী ক্বারী সাহেব জামেয়া আহমদীয়াতে গিয়ে পড়ানো শুরু করেন। এর পাশাপাশি জামেয়া নুসরাত গার্লস কলেজে (এটি জামা'তের কলেজছিল) পর্দার শর্ত বজায় রেখে মেয়েদেরও তিনি কুরআন শরীফ পড়াতেন।

(মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ৩৫-৩৬)

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাবওয়ার হাফেয ক্লাসের ইনচার্জ হাফেয শফীক্ব সাহেবের ওফাত হলে জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল মোহতরম মীর দাউদ সাহেব হাফেয সাহেবকে বলেন, (হিফয) ক্লাসে গিয়ে ক্লাস নিন। সেই দিনগুলোতে মসজিদে মুবারকেও একটি ক্লাস হতো। আমারও স্মরণ আছে, ছেলেরা মসজিদে বসে বসে হিফজ তথা পবিত্র কুরআন মুখস্ত করত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পরে ক্বারী সাহেবকে হাফেজ ক্লাসে নিযুক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ মঞ্জুরী প্রদান করেন আর একই সাথে আরো লেখেন, তিনি ওয়াকফে জাদীদেও পড়াবেন আর হাফেয ক্লাসেও পড়াবেন। অতএব ১৯৬৯ সনে হাফেয ক্লাসে রীতিমতো তাঁর নিযুক্তি দেওয়া হয়।

(মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ৪০-৪১)

১৯৯৮ সনে তিনি অবসরে যান। (মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ৫২)

তথাপি তিনি ২০১৯ পর্যন্ত মাদ্রাসাতুল হিফয এবং মাদ্রসাতুয জাফরে পবিত্র কুরআন পড়ানোর কাজ অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৪ সনের বরকতময় জলসা সালানায় তিনি প্রথম বারের মতো তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ক্বারী সাহেব নিজের ঘটনা লিখতে গিয়ে বলেন, ১৯৬৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ঐতিহাসিক এই সাক্ষাতের চিত্রতুলে ধরতে গিয়ে বলতেন, করমর্দ নের সৌভাগ্য লাভকরার সেই মুহূর্তটি আমার জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের কারণ হয়েছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি সাহেব হুযূর (রা.)-এর নিকট আমার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, ইনি ক্বারী মুহাম্মদ আশেক সাহেব, তিনি একজন নও মোবাঈন তথা নব দীক্ষিত আহমদী। তিনি যখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন হুযূর (রা.) স্নেহপরবশ হয়ে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আর আমিও হুযূর (রা.)-এর আশিসমণ্ডিত হাত ধরে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে থাকি।

(মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ২৮-৩০)

১৫ বছর পর্যন্ত তার ওপর পবিত্র রমজানে মসজিদে মুবারকে তারাবির নামায পড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হতে থাকে। নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব একবার তাকে বলেছিলেন, আপনার ওপর বার বার মসজিদে মুবারকে তাহাজ্জুদ ওতারাবির নামায পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করার কারণ হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আপনার তিলাওয়াত অনেক পছন্দ করেন।

(মেরি দাস্তান, সংকলক-হাফিজ মসরূর আহমদ ও মহম্মদ মকসুদ আহমদ, পৃ: ৩৫-৩৭)

তার বহু শিষ্য রয়েছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যারা তার গুণাবলী থেকে কল্যাণ লাভ করেছে এবং তার জ্ঞান থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। তাদের চিঠিপত্রও এসেছে। তারা তাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও তার বাসনা অনুসারে দোয়া ও নিষ্ঠার সৃষ্টি করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় নূরুদ্দীন আল হুসনি সাহেবের যিনি সিরিয়ার অনেক পুরোনো একজন আহমদী ছিলেন। ইদানিং সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন। আহমদী হওয়ার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে সৌদি আরবের একটি জেলে বন্দি ছিলেন। তিনি আসীরে রাহে মওলা তথা আল্লাহ্র পথে কারাবন্দি ছিলেন। বিভিন্ন অসুস্থতা ওকঠোরতা সত্ত্বেও ঈমানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অবশেষে এই বন্দী দশাতেই তিনি গত ৫ মে প্রায় ৮২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তাঁর পিতা আলহাজ্জ আব্দুর রউফ আল হুসনি সাহেব ১৯৩৮ সনে বয়আত করেছিলেন। সিরিয়া জামা'তের সাবেক আমীর জনাব মুনিরুল হুসনি সাহেব মরহুম নূরুদ্দীন আল হুসনি সাহেবের জ্যাঠা ছিলেন। মরহুম বাল্যকাল থেকেই ইসলামী স্বভাবচরিত্র এবং খিলাফতের ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন। তার পিতার মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ১৩ বা ১৪ বছর। মরহুম অধিকাংশ সময় জনাব মুনিরুল হুসনি সাহেবের সংস্পর্শে অবস্থান করতেন। তার কাছ থেকে তিনি জামা'ত সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন। ১৯৫৫ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন দামেস্কে যান তখন তিনি মরহুমের চাচা জনাব বদরুদ্দীন আল হুসনি সাহেবের বাড়িতে উঠেছিলেন। সেই দিনগুলোতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সম্মুখে তিনি একবার কুরআন তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি অনেক রোযা রাখতেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে তিনি বিশেষভাবে রোযা রাখতেন। কুরআন তিলাওয়াত করার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি কখনোই তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিতেন না।জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কারাগারেও তিনি নিজের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ বিষয়ে তার ঈমান ছিল যে, আল্লাহ্র সাহায্য সন্নিকটে– একথা তিনি তাদের সবাইকে বলতেন যারা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে কারাগারে যেতেন। তার অবর্তমানে তিনি বিধবা স্ত্রী রেখে গেছেন। তিনি আহমদী নন, তবে তিনি তার স্বামীর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, তার কারাজীবনের দিনগুলোতে এই মহিলা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার সন্তানদের মধ্যে ৩টি পুত্র রয়েছে। আব্দুর রউফ আল হুসনি

জুমআর খুতবা

উমায়ের ঘোড়ায় আরোহণ করে মুসলমানদের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে কিন্তু মুসলমানদের হাবভাবে এমন প্রতাপ, দৃঢ়সংকল্প এবং মৃত্যুর বিষয়ে এতটাই ভ্রুক্ষেপহীনতা দেখে যে, সে ভীষণ ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসে আর কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি তাদের পেছনে কোনো গুপ্ত সাহায্যকারী দল দেখি নি ঠিকই কিন্তু হে কুরাইশের দল! আমি দেখেছি মুসলমানদের সেনাদলে উটের হওদাগুলো মানুষ নয় বরং লাশ বহন করছে আর ইয়াসরেব (তথা মদীনার) উষ্ট্রীতে যেন লাশ বসে আছে। একথা শোনার পর কুরাইশদের মাঝে একধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়।

মহানবী (সা.)-এর একটি খুতবার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের সামনে খুতবা প্রদান করেন, যাতে (তিনি তাঁদেরকে) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তিনি (সা.) আরও বলেন, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন আর দুঃখবেদনা থেকে মুক্তি দেন।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা তুমি পূর্ণ করো, হে আল্লাহ্ ! তুমিআমাকে যে প্র তিশ্রুতি প্রদান করেছ তা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ্! তুমি যদি মুসলমানদের এ দলকে ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত হবে না।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা বদরের দিন মহানবী (সা.)-এর পেছনে থাকতাম। তিনি (সা.) শত্রুদের সবচেয়ে কাছে ছিলেন। সেদিন মহানবী (সা.) সকল যোদ্ধার চেয়ে কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন।

"হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধের সময় আমার মহানবী (সা.)-এর কথা মনে পড়ত, তখন আমি তাঁর তাঁবুর দিকে ছুটে যেতাম, কিন্তু যখনই আমি যেতাম তাঁকে সেজদায় পড়ে কাকুতিমিনতি করতে দেখতাম। আর আমি শুনেছি, তিনি (সা.) এ শব্দগুলি জপ করছিলেন যে, يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ অর্থাৎ হে আমার চিরঞ্জীব খোদা! হে আমার জীবনদাতা মালিক! হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এ অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন এবং মাঝে মাঝে অবলীলায় নিবেদন করতেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। আতঙ্কিত হবেন না, আল্ল াহ্ অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকরবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। কিন্তু এই ফার্সী সত্য প্রবাদ - *হার কেহ্ আরেফ তর আসত ওয়া তরসান তর*- অর্থাৎ যার যতটুকু জ্ঞান আছে সে ততটুকুই ভয় পায়– অনুসারে, মহানবী (সা.) লাগাতার দোয়া এবং কাকুতিমিনতিতে মগ্ন ছিলেন। " (হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

তিনি (সা.) যখন ছাউনিতে দোয়া করছিলেন তখন তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যান এরপর হঠাৎ জেগে উঠে বলেন, হে আবু বকর! আনন্দিত হও, তোমাদের আল্লাহ্ র সাহায্য এসে গেছে। এই দেখো! জিব্রাইলতার ঘোড়ার লাগাম ধরে সেটিকে ছুটিয়ে আসছে,তার পায়ে ধুলির চিহ্ন লেগে আছে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩০ জুন, ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (৩০ এহসান ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত সওয়াদ বিন গাযীয়্যাহ্ (রা.)'র ভালোবাসার অনন্য বহিঃপ্রকাশ সংক্রান্ত ঘটনা গত খুতবায় বর্ণ না করা হয়েছিল। তার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এরূপ– হযরত সওয়াদ বিন গাযীয়াহ্ (রা.) এই যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন আর মুশরিকদের মধ্য হতে খালেদ বিন হিশাম (নামী) এক ব্যক্তিকে বন্দীও করেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাকে খায়বারের ধন-সম্পদ একত্রিত করার জন্য আমেল বা কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কারো কারো মতে উপরোক্ত ঘটনাটি হযরত সওয়াদ বিন গাযীয়্যাহ্ (রা.)'র পরিবর্তে হযরত সওয়াদ বিন আমরের সাথে ঘটেছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, সেটি অন্য কোনো ঘটনা। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ঘটনা হযরত সওয়াদ বিন গাযীয়াহ্র নামেই বর্ণিত হয়েছে।

(উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন তা হলো, ২য় হিজরীর ১৭ইরমযান আর দিনটি ছিল শুক্রবার। খ্রিষ্টাব্দ হিসেবে ১৪ই মার্চ, ৬২৩ সন। প্রত্যুষে উঠে সর্বপ্রথম নামায পড়া হয় এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার পূজারীরা খোলা প্রান্তরে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়। এরপর মহানবী (সা.) জিহাদ সম্পর্কে একটি খুতবা প্রদান করেন। কিছুটা আলো ফুটলে তিনি (সা.) একটি তির দিয়ে ইশারা করে মুসলমানদের সারিগুলোকে বিন্যস্ত করতে আরম্ভ করেন। সওয়াদ নামের একজন সাহাবী সারি থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) তাকে তিরের ইশারায় পেছনে সরতে বলেন,কিন্তু দৈবক্রমে তাঁর (সা.) তিরের বাঁট সেই সাহাবীর বুকে লাগে। তিনি সাহসিকতার সাথে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খোদা আপনাকে সত্য ও ন্যায় সহকারে প্রে রণ করেছেন। কিন্তু আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে তির (দিয়ে) আঘাত করেছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি এর প্রতিশোধ নিব। সাহাবীরা (রাগে) দাঁত কিড়মিড় করছিলেন, বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, সওয়াদের হয়েছে কী? কিন্তু মহানবী (সা.) পরম স্নেহের সাথে বলেন, ঠিক আছে সওয়াদ! তুমিও আমাকে তির দিয়ে আঘাত করো। তিনি (সা.) নিজের বক্ষ থেকে কাপড় সরিয়ে দেন। সওয়াদ (রা.) ভালোবাসার আতিশয্যে এগিয়ে গিয়ে তাঁর (সা.) বক্ষে চুমু খান। মহানবী (সা.) হেসে বলেন, সওয়াদ এ তুমি কী করলে? তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! শত্রু সামনে (দাঁড়িয়ে আছে), এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবো কিনা জানি না। (তাই) আমি চাইলাম শাহাদতের পূর্বে আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহকে স্পর্শ করি।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ের এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। (তিনি) বদরের যুদ্ধের নয় বরং মৃত্যুর সময়কার ঘটনা বর্ণ না করেছেন যা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি (সা.) সাহাবীদের একত্রিত

করেন এবং বলেন, দেখো! আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। হতে পারে তোমাদের (প্রাপ্য) অধিকার প্রদানের বিষয়ে আমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে আর আমি তোমাদের মধ্য হতে কারো ক্ষতি করে থাকব। আমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবো যখন তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) বাদী হবে, এরপরিবর্তে আমি চাই যদি তোমাদের মধ্য থেকে আমার দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সে এই পৃথিবীতেই আমার কাছ থেকে নিজের ক্ষতিপূরণ (আদায়) করে নিক। মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের যে ভালোবাসা ছিল তার নিরিখে এটি (সহজেই) অনুমান করা যায়, তাঁর এ শব্দগুলোর মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে কতো না ছুরি চলে থাকবে এবং তাদের হৃদয় কতটা বিগলিত হয়ে গিয়ে থাকবে! বাস্তবেও এমনটিই হয়েছে। সাহাবীরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁদের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে, এমনকি তাঁদের জন্য কথা বলাও কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! যেহেতু আপনি বলেছেন "আমি কারো কোনো ক্ষতি করে থাকলে সে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক", তাই আমি আপনার কাছ থেকে একটি প্রতিশোধ নিতে চাই। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বলো আমার দ্বারা তোমার কি ক্ষতি হয়েছে? সেই সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! অমুক যুদ্ধের সময় আপনি সারি সোজা করছিলেন। আপনার একটি সারি অতিক্রম করে সামনে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আপনি যখন সারি পার হয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন আপনার কনুই আমার পিঠে লেগে যায়। আজ আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। সাহাবীরা বলেন, সেই সময় ক্রোধের বশে আমাদের তরবারি খাপ থেকে বাইরে বের হয়ে আসছিল আর আমাদের চোখ রক্তিম হতে থাকে। মহানবী (সা.) যদি তখন আমাদের সামনে না থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে কেটেটুকরো টুকরো করে ফেলতাম। কিন্তু মহানবী (সা.) নিজের পিঠ তার দিকে ফিরিয়ে বলেন, তোমার প্রতিশোধ নাও এবং আমাকেও সেভাবেই কনুই দ্বারা আঘাত করো। সেই সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! এভাবে নয়। যখন আপনার কনুই আমার দেহে লেগেছিল তখন আমার পিঠ উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু আপনার পিঠের ওপর তো কাপড় রয়েছে? মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আমার পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দাও যেন এই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে। সাহাবীরা যখন মহানবী (সা.)-এর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দেন তখন সেইসাহাবী কম্পিত ঠোঁটে এবং প্রবহমান অশ্রুধারার মাঝে সামনে অগ্রসর হন এবং মহানবী (সা.)-এর নগ্ন পিঠে ভালোবাসাপূর্ণ চুমু খান আর বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কোথায় প্রতিশোধ আর কোথায় এই নগণ্য দাস!

হুযূরের কথায় যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, হয়তো সেই সময় নিকটে যার কথা চিন্তা করলেও আমাদের (শরীরের) পশম দাঁড়িয়ে যায় তখন আমার ইচ্ছা হলো, আমার ঠোঁট যেন একবার এই কল্যাণমণ্ডিত দেহকে স্পর্শ করে যাঁকে খোদা তা'লা সকল কল্যাণের সমাহার বানিয়েছেন। অতএব, আমিএই বাসনা পূর্ণ করার মানসে কনুই লাগার বিষয়টিকে অজুহাত বানালাম মাত্র। আমি শেষবার আপনাকে চুমু দিতে চাইলাম। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কনুইয়ের আঘাত তো কিছুই নয় আমাদের সবকিছুই আপনার জন্য নিবেদিত। আপনাকে কোনোভাবে চুমু খাওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমার হৃদয় একটি অজুহাত খুঁজছিল মাত্র! সেসব সাহাবী যাঁরা (পূর্বে) এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত ছিল, তার কথা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিল, যখন তারা এই দৃশ্য দেখে যে তার হৃদয়ে বিরাজ করছে ভিন্ন কিছু, তখন তারা বলে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের ওপর রাগ হতে থাকে যে, আমরা কেন আমাদের প্রেমাস্পদকে চুমু দেওয়ার সুযোগ পেলাম না ?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের হাদী ও পথপ্রদর্শক অর্থাৎ মহানবী (সা.)। যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সেই আদর্শ রেখে গেছেন যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো নবীর মাঝে পাওয়া যায় না। "

(উসওয়ায়ে হাসানাহ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড- ১৭, পৃ: ১২৮-১৩০)

বদরের যুদ্ধে সাহাবীদের স্লোগান অর্থাৎ (পরিচিতিমূলক) চিহ্ন কী ছিল? এ সম্পর্কে, হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণি ত হয়েছে, যুদ্ধের দিনমুহাজিরদের (পরিচিতিমূলক) চিহ্ন ছিল 'ইয়া বনী আব্দুর রহমান' এবং খাযরাজ গোত্রের (পরিচিতিমূলক) চিহ্নছিল 'ইয়া বনী আব্দুল্লাহ্', আর অওস গোত্রের (পরিচিতিমূলক) চিহ্নছিল 'ইয়া বনী ওবায়দুল্লাহ্' এবং মহানবী (সা.) তাঁর অশ্বারোহীদের'খায়লুল্লাহ্'নাম দিয়েছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে, সেদিন সবার (পরিচিতিমূলক) চিহ্নছিল 'ইয়া মনসূরো আমিত'! অর্থাৎ হে মনসূর মেরে ফেলো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪)

আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, বদরের যুদ্ধে মদীনার আনসারের চিহ্ন ধ্বনি (অর্থাৎ যেমনটি আমি বলেছি স্লোগান) ছিল আহাদ যা নির্ধারণ করার কারণ ছিল, যাতে রাতের আঁধারে এবং প্র বল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় যেন চেনা যায় যে, এরা আনসারী সাহাবী(শত্রু নয়)। অনুরূপভাবে মুহাজির মুসলমানদের চিহ্ন ছিল 'ইয়া বনী আব্দির রহমান'।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪২)

যুদ্ধ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর যেসব নির্দেশনা ছিল সেগুলো আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, মহানবী (সা.) সারিগুলো সোজা করার পর সাহাবীদের বলেন, আমি তোমাদের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা আক্রমণ করবে না। যদি শত্রুরা তোমাদের কাছে এসে যায় তাহলে তির নিক্ষেপ করে তাদেরকে পেছনে ঠেলে দেবে, কেননা বেশি দূর থেকে তির নিক্ষেপ করা অধিকাংশ সময় নিষ্ফল প্রমাণিত হয় আর তির নষ্ট হতে থাকে। অনুরূপভাবে তরবারিও ততক্ষণ বের করবে না যতক্ষণ শত্রুরা একেবারেই কাছে না আসে।

মহানবী (সা.)-এর একটি খুতবার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের সামনে খুতবা প্রদান করেন, যাতে (তিনি তাঁদেরকে) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তিনি (সা.) আরও বলেন, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন আর দুঃখবেদনা থেকে মুক্তি দেন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪২) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২)

এক স্থানে মহানবী (সা.)-এর একটি খুতবার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে তুলে ধরা রয়েছে যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্ত ন করে বলেন, আমি তোমাদের সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছি যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর সেই জিনিস থেকে তোমাদের বারণ করছি যা থেকে তিনি তোমাদের বারণ করেছেন। মহাসম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্যের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি সত্যবাদীতা পছন্দ করেন। তিনি পুণ্যবানদের উন্ন ত মর্যাদা দান করেন যা তাঁর কাছে রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের স্মৃতিচারণ করা হয়। এর মাধ্যমে তারা একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আজ তোমরা সত্যের গন্তব্যসমূহের মধ্য থেকে একটি গন্তব্যে রয়েছ। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তা-ই গ্রহণ করেন যা তাঁর সন্ত ষ্টির জন্য করা হয়। কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ এমন জিনিস যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন, দুঃখ থেকে মুক্তি দেন। পরকালেতোমরা এর মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করবে। এর মাধ্যমেই মুক্তি পাবে, অর্থাৎ ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার নবী (সা.) উপস্থি ত আছেন। তিনি তোমাদের সতর্ক করেন আর নির্দেশ দেন যে, আজ আল্লাহ্ তা'লার সাথে পর্দা করো পাছে তিনি তোমাদের বিষয়ে এমন কোনো জিনিস সম্পর্কে অবগত হবেন যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***'লা মাকতুল্লাহি আকবারু মিন মাকতিকুম আনুফুসাকুম'*** (সূরা আল্ মো'মেন: ১১)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি তোমাদের পারস্পরিক অসন্তুষ্টির বিপরীতে অধিক বড় ছিল। সেই জিনিসের প্রতি দেখো যার নির্দেশ কিতাবে তিনি তোমাদের দিয়েছেন, আর তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শ নাবলী প্রদর্শ ন করেছেন আর লাঞ্ছনার পর তোমাদেরকে সম্মান দান করেছেন। খোদার আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো যেন তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এক্ষেত্রে তোমরা নিজ প্রভুর পরীক্ষায় কৃতকার্য হও, তাহলে তোমরা তাঁর কৃপা ও ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠবে যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। তাঁর কথা সত্য। তাঁর শাস্তি কঠোর। আমি এবং তোমরা আল্লাহ্র সাথে আছি, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমরা তাঁর কাছে স্বীয় বিজয়ের জন্য দোয়া করি, তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরি, তাঁরই ওপর ভরসা করি, তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও মুসলমানদের ক্ষমা করুন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪)

এটি ছিল তার (খুতবার) বিশদ বিবরণ।

যুদ্ধের সময় কতিপয় লোককে হত্যা করতে মহানবী (সা.) নিষেধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণ না করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন স্বীয় সাহাবীদের বলেছিলেন যে, আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশেম এবং আরও কিছু লোক কুরাইশের সাথে বাধ্য হয়ে (যুদ্ধে) এসেছে, স্বেচ্ছায় আসেনি। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। অতএব তোমাদের মাঝে কেউ যখন বনু হাশেম গোত্রের কারো মুখোমুখি হবে সে যেন তাকে হত্যা না করে। আর যে আবুল বাখতারী'র মুখোমুখি হবে সে যেন তাকে হত্যা না করে এবং যে মহানবী (সা.)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের মুখোমুখি হবেসে যেন তাকেও হত্যা না করে, কেননা এরা বাধ্য হয়ে কুরাইশের সাথে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবাহ্ (রা.) বলেন, আমরা আমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দেবো? আল্লাহ্র কসম! আমি যদি তাকে অর্থাৎ আব্বাসকে পাই তাহলে অবশ্যই তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব(রা.)-কে বলেন, হে আবু হাফস! হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! এটি প্রথম দিন ছিল যখন কিনা

মহানবী (সা.) আমাকে আবু হাফস উপনামে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ র চাচাকে কি তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে? হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি তরবারি দিয়ে তার (আবু হুযায়ফা) শিরোচ্ছেদ করতে পারি। তিনি (উমর) নিবেদন করেন, আল্লাহ্র কসম! সে অর্থাৎ আবু হুযায়ফা কপটতা প্রদর্শ ন করেছে। হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) পরবর্তীতে বলতেন, সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম তার কারণে শান্তিতে ছিলাম না আর সর্বদা এ বিষয়ে ভয়ে ছিলাম আর কেবল শাহাদতই আমার একথার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতো। অতএব হযরত হুযায়ফা (রা.) ইয়ামামা-র যুদ্ধের দিন শহীদ হন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে এটিও বলেন যে, কাফিরবাহিনীতে কতক এমন মানুষও আছে, যারা সানন্দে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি, বরং কুরাইশ নেতাদের চাপে পড়ে অংশগ্রহণ করেছে। অন্যথায় তারা হৃদয়ের দিক থেকে আমাদের বিরোধী নয়। অনুরূপভাবে কতক এমন মানুষও এই সৈন্যবাহিনীতে রয়েছে যারা মক্কায় আমাদের বিপদের সময় আমাদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করেছিল এবং তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া আমাদের দায়িত্ব; অর্থাৎ তাদের সেই ভদ্র ব্যবহারের কারণে যা তারা মক্কায় মুসলমানদের প্রতি প্রদর্শন করেছিল। অতএব এমন কোনো ব্যক্তির ওপর যদি কোনো মুসলমান বিজয় লাভ করে তবেতাকে কোনো প্রকার কষ্ট যেন না দেয়। আর তিনি (সা.) বিশেষভাবে প্রথম শ্রেণির মাঝে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে আবুল বাখতারী'র নাম নিয়েছেন আর তাদেরকে হত্যা করতে বারণ করেছেন, অর্থাৎ এরা মুসলমানদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করত, তাই নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, আবুল বাখতারী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। যদিও মৃত্যুর পূর্বে সে একথা জেনে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করতে বারণ করেছিলেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬০-৩৬১)

ইতিহাসে বর্ণি ত হয়েছে যে, এরপর মহানবী (সা.) তাঁবুতে বা তাঁর জন্য যে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল তাতেগিয়ে পুনরায় দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। হযরতআবু বকর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন এবং তাঁবুর চারদিকে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নেতৃত্বে একদল আনসার প্রহরায় নিয়োজিত ছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের দিন একটি বড় তাঁবুতে অবস্থান করেন এবং তিনি বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَنۡشُدُكَ عَهۡدَكَ وَوَعۡدَكَ. اَللّٰهُمَّ اِنۡ شِئۡتَ لَمۡ تُعۡبَدۡ بَعۡدَ الۡيَوۡمِ। অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্ ! আমি তোমাকে তোমারই প্রতিশ্রুতি এবং তোমারই অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আমার আল্লাহ্ ! তুমিই যদি মুসলমানদের ধ্বংস চাও তবে আজকের পর তোমার ইবাদতকারী আর কেউ থাকবে না।

ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) হাত ধরে বসেন। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! ক্ষান্ত হন। আপনি আপনার প্রভুর নিকট দোয়ায় অনেক বেশি কাকুতিমিনতি করেছেন আর তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন, অর্থাৎ তিনি (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁবু থেকে বের হন এবং তিনি (সা.) পড়ছিলেন, سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّوۡنَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَالسَّاعَةُ اَدۡهٰى وَاَمَرُّ (সূরা আল্ কমর: ৪৬-৪৭)। অর্থাৎ শীঘ্রই এরা সবাই পরাজিত হবে এবং পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করবে আর এটিই সেই মুহূর্ত যে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল এবং এটি অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত সময়।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-২৯১৫)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বদরের দিন মহানবী (সা.) মুশরিকদের দেখেন, তারা এক হাজার এবং তাঁর সঙ্গী ছিলেন ৩১৯জন। তখন আল্লাহ্র নবী (সা.) কিবলামুখী হয়ে নিজের উভয় হাত প্রসারিত করে উচ্চঃস্বরে স্বীয় প্রভুকে ডেকে ডেকে বলেন, اَللّٰهُمَّ اَنۡجِزۡ لِیۡ مَا وَعَدۡتَّنِیۡ. اَللّٰهُمَّ اٰتِ مَا وَعَدۡتَّنِیۡ. اَللّٰهُمَّ اِنۡ تُهۡلِكۡ هٰذِهِ الۡعِصَابَةَ مِنۡ اَهۡلِ الۡاِسۡلَامِ لَا تُعۡبَدۡ فِی الۡاَرۡضِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা তুমি পূর্ণ করো, হে আল্লাহ্ ! তুমিআমাকে যে প্র তিশ্রুতি প্রদান করেছ তা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ্! তুমি যদি মুসলমানদের এ দলকে ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত হবে না।

কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত প্রসারিত করে তিনি (সা.) ক্রমাগত স্বীয় প্রভুকে উচ্চঃস্বরে ডাকতে থাকেন, এমনকি তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধ থেকে পড়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধে তুলে দেন। অতঃপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-কে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র নবী (সা.)! আপনার প্রভুর সমীপে আপনার মিনতি ভরা দোয়া আপনার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অবশ্যই আপনাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, اِذۡ تَسۡتَغِيۡثُوۡنَ رَبَّكُمۡ فَاسۡتَجَابَ لَكُمۡ اَنِّیۡ مُمِدُّكُمۡ بِاَلۡفٍ مِّنَ الۡمَلٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِيۡنَ (সূরা আল্ আনফাল: ১০)। অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছিলেতখন তিনি তোমার কাকুতিপূর্ণ দোয়া এই প্রতিশ্রুতিসজ্জিত করে কবুল করেছিলেন যে, আমি অবশ্যই সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশ্ তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। অতএব আল্লাহ্ ফিরিশ্ তাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছেন। এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস- ৪৫৮৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর পুস্তকে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁবুতে গিয়ে দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নেতৃত্বে আনসারের একটিদল ছাউনির চারপাশে পাহারায় ছিল। কিছুক্ষণ পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি আওয়াজ উঠলে জানা যায়, কুরাইশ বাহিনী গণহামলা শুরু করেছে। তখন মহানবী (সা.) অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্র দরবারে দু'হাত প্রসারিত করে দোয়া করছিলেন এবং একান্ত ব্যাকুলচিত্তে বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَنۡشُدُكَ عَهۡدَكَ وَوَعۡدَكَ. اَللّٰهُمَّ اِنۡ تُهۡلِكۡ هٰذِهِ الۡعِصَابَةَ مِنۡ اَهۡلِ الۡاِسۡلَامِ لَا تُعۡبَدۡ فِی الۡاَرۡضِ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্ ! তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। হে আমার মালিক! মুসলমানদের এ দলটি যদি আজ এই প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না। আর সে সময় তিনি (সা.) এত বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, কখনো তিনি (সা.) সেজদায় পড়ে যেতেন আবার কখনোবা দাঁড়িয়ে খোদাকে ডাকতেন আর তাঁর চাদর কাঁধ থেকে বার বার পড়ে যেত এবং হযরত আবু বকর (রা.) তা বার বার তুলে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিতেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধের সময় আমার মহানবী (সা.)-এর কথা মনে পড়ত, তখন আমি তাঁর তাঁবুর দিকে ছুটে যেতাম, কিন্তু যখনই আমি যেতাম তাঁকে সেজদায় পড়ে কাকুতিমিনতি করতে দেখতাম। আর আমি শুনেছি, তিনি (সা.) এ শব্দগুলি জপ করছিলেন যে, يَا حَیُّ يَا قَيُّوۡمُ يَا حَیُّ يَا قَيُّوۡمُ অর্থাৎ হে আমার চিরঞ্জীব খোদা! হে আমার জীবনদাতা মালিক! হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এ অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন এবং মাঝে মাঝে অবলীলায় নিবেদন করতেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। আতঙ্কিত হবেন না, আল্ল াহ্ অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকরবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। কিন্তু এই ফার্সী সত্য প্রবাদ - ***হার কেহ্ আরেফ তর আসত ওয়া তরসান তর-*** অর্থাৎ যার যতটুকু জ্ঞান আছে সে ততটুকুই ভয় পায়- অনুসারে, মহানবী (সা.) লাগাতার দোয়া এবং কাকুতিমিনতিতে মগ্ন ছিলেন।

(সীরাত খাতামান্নাবঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬১)

তাওয়াক্কুল কী? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে সাহাবীদের (যুদ্ধের জন্য) বিন্যস্ত করেছেন। তাঁদেরকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে দিকনির্দেশনামূলক উপদেশ দিয়েছেন যে, এভাবে লড়াই করতে হবে। এরপর তিনি একটি উঁচু স্থানে তাঁবুতে বসে দোয়ায় রত হয়ে যান। এমন নয় যে, তিনি সাহাবীদের মদীনায় ছেড়ে তিনি একাই সেখানে বসে দোয়ায় রত হয়েছেন বরং প্রথমে সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন এরপর তাঁদেরকে বিন্যস্ত করে নির্দে শনামূলক উপদেশ দিয়েছেন আর এরপর তিনি ছাউনিতে বসে দোয়া করতে আরম্ভ করেছেন। এটি হলো তাওয়াক্কুল বা খোদা নীর্ভরতা যা অবলম্বন করা উচিত।

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৪১)

অর্থাৎ উপকরণও ব্যবহার করতে হবে, মানুষ নিজ চেষ্টায় যতটুকু করতে পারে তা করে তারপর দোয়ায় রত হতে হয়- এটিকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে বারবার মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় যা ইসলামের প্রথমযুদ্ধ ছিল তখন মহানবী (সা.) আহাজারী ও দোয়া করতে আরম্ভ করে দেন এবং দোয়া করতে করতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে اَللّٰهُمَّ اِنۡ اَهۡلَكۡتَ هٰذِهِ الۡعِصَابَةَ فَلَنۡ تُعۡبَدَ فِی الۡاَرۡضِ اَبَدًا বাক্য নিসৃত হয় অর্থাৎ হে আমার খোদা! আজ যদি তুমি এই দলটিকে (যাতে কেবল তিনশ তের জন ছিল) ধ্বংস করে দাও তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ আর তোমার ইবাদত করবে না। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এসব শব্দ মহানবী (সা.)-এর মুখে শোনেন তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আল্ল াহ্ তা'লা তো আপনাকে বিজয়ের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। তিনি (সা.) বলেন, একথা ঠিক; কিন্তু আমার দৃষ্টি খোদার

অমুখাপেক্ষিতার ওপর অর্থাৎ কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা খোদার জন্য আবশ্যক কর্তব্য নয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২১, পৃ: ২৫৫-২৫৬ -এর পরিশিষ্টাংশ)

আল্লাহ্ তা'লা খুবই পরবিমুখ, এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকা, চিন্তিত থাকা।

তিনি (সা.) যখন ছাউনিতে দোয়া করছিলেন তখন তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যান এরপর হঠাৎ জেগে উঠে বলেন, হে আবু বকর! আনন্দিত হও, তোমাদের আল্লাহ্ র সাহায্য এসে গেছে। এই দেখো! জিব্রাইলতার ঘোড়ার লাগাম ধরে সেটিকে ছুটিয়ে আসছে,তার পায়ে ধুলির চিহ্ন লেগে আছে। এটি সিরাতে ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৮)

এরপর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হুযূর (সা.) বলেছেন, হে আবু বকর! সুসংবাদ গ্রহণ করো, এই হলো জিব্রাঈল যে হলুদ পাগড়ি পরে আছে; সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে নিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে যখন পৃথিবীতে অবতরণ করে তখন কিছুক্ষণের জন্য আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে যায় এরপর আবার প্রকাশিত হয়। তার ঘোড়ার পা ধুলিমাখা ছিল। সে বলছিল, আপনি দোয়া করেছেন তাই আল্লাহ্র সাহায্য আপনার কাছে চলে এসেছে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭)

বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) যুবায়ের বিন আওয়ামকে ডান বাহুতে নিযুক্ত করেছেন আর বাম বাহুতে মিকদাদ বিন আমরকে এবং কায়েস বিন আবী সা'সা'কে পদাতিক বাহিনীর ওপর নিযুক্ত করেছেন। পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সার্বিকভাবে মহানবী (সা.)-এর হাতেই ছিল। মহানবী (সা.) প্রথম সারিগুলোতে ছিলেন। মহানবী (সা.) সব সাহাবীকে তাঁর নির্দেশনাধীন রেখেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি আগে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ এগিয়ে যাবে না। একইভাবে মহানবী (সা.) অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে নসীহত করে বলেন, শত্রুরা তোমার নাগালে পৌঁছালে তোমরা তির নিক্ষেপ করবে। আর যতটা সম্ভব তির বাঁচিয়ে রাখবে।

মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া করার সম্পূর্ণ ঘটনাটি যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কেননা এমনভাবে লেখা হয়েছে যা হতে মনে হয় যেন, মহানবী (সা.) যুদ্ধে অংশ নেননি। মহানবী (সা.) যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু এর পূর্বে তিনি দোয়া করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতার সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন।} যাহোক, বর্ণিত আছে, বদরের রণক্ষেত্রে কার্যত মহানবী (সা.)-এর অংশ নেওয়ার বিষয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা বদরের দিন মহানবী (সা.)-এর পেছনে থাকতাম। তিনি (সা.) শত্রুদের সবচেয়ে কাছে ছিলেন। সেদিন মহানবী (সা.) সকল যোদ্ধার চেয়ে কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন।

[মারেফে সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৪ ও ২০১]

যুদ্ধ ক্ষেত্রে কুরাইশ বাহিনীর আগমন ও তাদের পারস্পারিক মতানৈক্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন কুরাইশরা বদরের প্রান্ত রে আসে তখন তারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কতজন যোদ্ধা রয়েছে তা দেখার জন্য প্রেরণ করে। উমায়ের তার ঘোড়া নিয়ে মুসলমান বাহিনীর চারপাশ প্রদক্ষিণ করে এবং কুরাইশ বাহিনীর কাছে এসে বলে, আমার মনে হয় (সৈন্য সংখ্যা) তিনশ'র চেয়ে কিছুটা কম বা বেশি হবে। মুসলমান বাহিনীর সাহায্যার্থেআরো কোনো দল গুপ্তস্থানে ওৎ পেতে আছে কিনা তা দেখার জন্য সে পুনরায় বের হয়ে যায়। উমায়ের বিন ওয়াহাব তার ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূর চলে যায় এবং সেখান থেকে ফেরত এসে বলে, মনে হয়না এদের কোনো সাহায্যকারী আছে। তবে হে কুরাইশ! আমি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ ধেয়ে আসতে দেখছি। আমি এমন এমন উষ্ট্রী দেখেছি যা লাশ বহন করেনিয়ে এসেছে। মদীনার উট নিঃসন্দেহে লাশ বহন করছে। তাঁরা এমন জাতি যাদের কাছে আত্মরক্ষার কোনো সরঞ্জাম নেই আর তাঁদের কাছে তরবারি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তারা আমাদের একেক জনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাদের কেউ নিহত হবে না। তারা যদি নিজেদের সংখ্যার নিরিখে আমাদের লোকদের হত্যা করে তাহলে আমাদের জীবনের আর কি মানে থাকবে। এখন তোমাদের যা ঠিক মনে হয় করো। সে পর্যবেক্ষণ করে নিজের মতামত ব্যক্ত করে।

হাকীম বিন হিযাম এই কথাগুলো শুনে উতবাহ্ বিন রবীয়্যার কাছে এসে বলে, তুমি কুরাইশের মাঝে মর্যাদাশীল নেতা, তাই লোকদেরকে ফেরত নিয়ে চলো এবং আমর বিন হাযরামীর রক্তপণ পরিশোধ করে দাও। উতবাহ্ বলে, আমি তোমার কথায় সম্মত আছি। তুমি হানযালার পুত্র আবু জাহলের কাছে যাও। হাকীম বিন হিযাম এই উদ্দেশ্যে আবু জাহলের কাছে যায় এবং বলে, আমাকে উতবাহ্ তোমার কাছে প্রেরণ করেছে। সে রক্তপণ আদায় করে দিবে, তুমি কুরাইশদের ফেরত নিয়ে যাও। আবু জাহল বলে, উতবাহ্ মহম্মদ (সা.)-কে দেখেই ভয় পেয়ে গেছে এবং কাপুরষতা প্রদর্শন করছে; কখনো নয়।

খোদার কসম! আমরা ফেরত যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে মীমাংসা করে নাদেন। আবু জাহল আরো বলে, উতবাহ্ আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখছে; কেননা সে জানে মুসলমানরা আমাদের কাছে উটের এক লোকমাসদৃশ অর্থাৎ অত্যন্ত সহজে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলব। আর মুসলমানদের মাঝে উতবাহ্ র ছেলেও অন্তর্ভুক্ত। উতবাহ্র ছেলে মুসলমান হয়েছিল। সম্ভবত সে তার ছেলের কারণেই যুদ্ধ করতে চায় না। উতবাহ্র ছেলের নাম ছিল আবু হুযায়ফা, যিনি বদরের যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উতবাহ্যখন আবু জাহলের পক্ষ থেকে কাপুরুষতার খোঁটা শুনতে পায় তখন সে বলে, আবু জাহল খুব দ্রুতই জানতে পারবে, কে কাপুরুষ ও ভীতত্রস্ত।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৪-৪২৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই বিষয়ে বিস্তারিতবর্ণ না করতে গিয়ে বলেন, উভয় বাহিনী একান্ত মুখোমুখি অবস্থান নেয়। পূর্বে সেনা সমাবেশ ঘটছিল আর কাফিরের সেনাবাহিনী ছিল বৃহৎ সংখ্যায়, এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) দোয়ায় রত ছিলেন। সেনাবাহিনী যখন একেবারে মুখোমুখি দণ্ডায়মান হয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যখন উভয় সেনাদল একেবারে সামনা-সামনি ছিল কিন্তু সেসময় ঐশী মহিমার অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। তখন সেনাবাহিনী এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল যে, ইসলামী সেনাদল কুরাইশদের বাহিনীর চেয়ে অধিক বরং দ্বিগুণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ফলে কাফিররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল আর অপরদিকে কুরাইশের সেনাদল মুসলমানদের দৃষ্টিতে সঠিক সংখ্যার তুলনায় কম দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, ফলে মুসলমানদের মনোবল সুদৃঢ় হয়।

কুরাইশরা যে কোনোভাবে ইসলামী সেনাদলের সঠিক সংখ্যার ধারণা লাভের চেষ্টা করছিল যেন মনোবলহারা হৃদয়গুলোতে কিছুটা সাহস যোগানো সম্ভব হয়। (যেসব হৃদয় ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যেন তাদের মনোবল বাড়ানো যায়।) এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে প্রে রণ করে, সে যেন মুসলিম সেনাবাহিনীর চতুষ্পার্শ্বে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সেনাসংখ্যা কত এবং তাদের পেছনে আরো কোনো সাহায্যকারী দল লুকিয়ে আছে কি না? তদনুযায়ী উমায়ের ঘোড়ায় আরোহণ করে মুসলমানদের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে কিন্তু মুসলমানদের হাবভাবে এমন প্রতাপ, দৃঢ়সংকল্প এবং মৃত্যুর বিষয়ে এতটাই ভ্রুক্ষেপহীনতা দেখে যে, সে ভীষণ ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসে আর কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি তাদের পেছনে কোনো গুপ্ত সাহায্যকারী দল দেখি নি ঠিকই কিন্তু হে কুরাইশের দল! আমি দেখেছি মুসলমানদের সেনাদলে উটের হওদাগুলো মানুষ নয় বরং লাশ বহন করছে আর ইয়াসরেব (তথা মদীনার) উষ্ট্রীতে যেন লাশ বসে আছে। একথা শোনার পর কুরাইশদের মাঝে একধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়।

সুরাকা যে তাদের জামিনদার হয়ে এসেছিল, সে এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে আর মানুষজন যখন তাকে আটকানোর চেষ্টা করে তখন সে বলে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

হাকীম বিন হিযাম উমায়েরের মতামত শুনে ভীত-ত্রস্ত হয়ে উতবাহ্ বিন রবীয়্যার কাছে আসে এবং বলে, হে উতবাহ্! তুমি তো মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে আমের বিন হাযরামীর প্রতিশোধই নিতে চাও- তাই না! সে তোমার মিত্র ছিল। এমনটি কি হতে পারে না যে, তুমি তার পক্ষ থেকে রক্তপণ আদায় করে দিবে আর কুরাইশকে নিয়ে ফেরত চলে যাবে! এতে সদাসর্বদা তোমার সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। উতবাহ্ নিজেও ভীতত্রস্ত ছিল, তার আর কী চাই, তৎক্ষণাৎ সে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এতে একমত। এরপর উতবাহ্ হাকীম বিন হিযামকে উদ্দেশ্য করে বলে, মুসলমান আর আমরা পরস্পর আত্মীয়ই তো। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আর পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে- এটি কি ভালো দেখায়? তুমি এক কাজ করো, এক্ষুনি আবুল হাকাম (তথা আবু জাহল)-এর কাছে যাও এবং তাকে গিয়ে এই প্রস্তাব দাও। অপরদিকে উতবাহ্ স্বয়ং উটে আরোহণ করে স্বপ্রণোদিত হয়ে লোকদেরকে বুঝাতে শুরু করে যে, আত্মীয়ের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ ভালো নয়। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত আর মুহাম্মদকে (সা.) তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত, সে অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর সাথে বোঝাপড়া করুক। পরিণতি যা হবে তা পরে দেখা যাবে। এছাড়া তোমরা দেখো! ঐ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা কোনো সহজ কাজ নয়। তোমরা আমাকে ভীরু বা কাপুরুষ যা-ই বলো আমি ভীরু নই। আমি তো এদেরকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে দেখতে পাচ্ছি।

মহানবী (সা.) দূর থেকে উতবাহ্কে দেখে বলেন, কাফির সেনাদলের কারো মাঝে যদি সততা থেকে থাকলে ঐ লাল উটে আরোহিত ব্যক্তির মাঝে নিশ্চিতভাবে তা আছে। যদি এরা ঐ ব্যক্তির কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের জন্য উত্তম হবে। হাকীম বিন হিযাম আবু জাহলের কাছে আসে এবং তার কাছে উক্ত প্রস্তাব দেয়। কিন্তু উম্মতের ফেরাউন কি আর এমন প্রস্তাবে সম্মত হয়! তৎক্ষণাৎ বলে, আচ্ছা আচ্ছা, উতবাহ্ এখন নিজের সামনে আত্মীয়-স্বজন দেখতে পাচ্ছে। এরপর সে আমর বিন হাযরামীর ভাই আমের হাযরামীকে ডেকে বলে, তুমি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 10 Aug, 2023 Issue No.32

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২য় পাতার পর.....

নাগরিকরা অত্যন্ত অন্তর্মুখী, খুব সহজে মানুষের সঙ্গে মেশে না। হুযুর আনোয়ার বলেন, বেশ, তবে ব্যক্তিগত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করুন। নিজেদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করুন, তারাও যেন বুঝতে পারে। বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করুন এবং তাদেরকে আমন্ত্রিত করুন। ছোটখাট আকারে সেমিনার করুন,দুই তিন মাসে সেমিনার করা যেতে পারে। আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করুন, এমন কোন অনুষ্ঠান হলে তাদেরকে আমন্ত্রিত করুন, সেখানে তারা আপনাদের কথা শুনবে। শুনলে পরে তারা নিজেরাই প্রশ্ন করবে। ধীরে ধীরে পরিচিতি গড়ে উঠবে। এরপর পত্রিকায় চিঠি লিখে ইসলামের বিষয়ে জানান, শান্তি, এবং বিশ্বশান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং সমসাময়িক বিষয়রে উপর মত বিনিময় হওয়া উচিত। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের মতামত কি সে সম্পর্কে জানান। এরফলে তাদের মধ্যে মনোযোগ সৃষ্টি হবে এবং চিন্তা করবে যে, এরা কেবল পুরোনো গতানুগতিক কথা বলে না, কেবল ধর্ম ধর্ম করে মাতামাতি করে না এবং আমাদেরকে প্ররোচিত করে না বরং সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা করে আমাদের দিকনির্দেশনা করতে পারে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের জড়তা কাটলে পরিচিতি তৈরী হবে। ইনশাআল্লাহ।

যে সব ফিনিশদের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব রয়েছে তারা বেশ খোলাখুলি কথা বলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরীর পাশাপাশি ইসলামের একটা সার্বিক ভাবমূর্তিও তাদের সামনে আপনাদেরকে তুলে ধরতে হবে। সোশাল মিডিয়া এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন সমাবেশ ও সেমিনারে এই ধরণের আলোচনা করুন।

একজন আমেলা সদস্য প্রশ্ন করেন, লোকেদের মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠের প্রতি কিভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছোট ছোট উদ্ধৃতি তৈরী করে সেগুলি ছাপিয়ে মানুষকে দিন। একটি বই বার বার পড়া কঠিন, বিশেষ করে সেই সব মানুষের জন্য যাদের পড়ার প্রতি আগ্রহ কম। তাই উদ্ধৃতি তৈরী করে তাদেরকে দিয়ে দিলে সেই বিষয়ের উপর তাদের কিছু না কিছু মনোযোগ অবশ্যই সৃষ্টি হবে। ইংরেজি বা উর্দুতে টাইপ করে লোকের বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসবেন। বই না হলেও কমপক্ষে উদ্ধৃতিগুলিই পড়া শুরু হোক। আলফযল পত্রিকায় এমন অনেক উদ্ধৃতি আসে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি সেখান থেকে সংগ্রহ করে মানুষকে দিন। লোকে কিছু না কিছু তো শিখবেই। তাছাড়া আজকাল মানুষের পড়ার প্রতি ঝোঁক কম। ঝোঁক বেশি সোশাল মিডিয়ায় কিছু দেখা, শোনা- ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে যেটুকু কানে ঢোকে সেটুকু শোন বা টিভির অনুষ্ঠান দেখা। এদিকে মানুষের ঝোঁক বেশি। এছাড়া অডিও বুকস তৈরী করুন। সেগুলি তৈরী করে দিলে রাস্তাঘাটে চলার সময়, গাড়ি চালানোর সময়, এদিক সেদিক যাওয়ার সময় কানে লাগিয়ে শুনতে পারে। এটাও আগ্রহের বিষয়। পড়ার আগ্রহ এমনিতেই হারিয়ে যাচ্ছে। একারণে ছোট ছোট উদ্ধৃতি আকারে বিষয় নির্বাচন করুন, যেমন নামাযের প্রয়োজনীয়তা, খোদার একত্ব; আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় প্রিন্ট করে মানুষকে দিন। এবং অডিও বুকস আকারেও দিন। তবেই তো লোকের কানে সেগুলি ঢুকবে। এতে কিছুটা হলেও কাজ করবে। বই পড়ার চল এখন আর নেই, শোনার চল শুরু হয়েছে। আল ইসলাম ওয়েব সাইটও অনেকগুলি অডিও বুকস তৈরী করে রেখেছে।

২য় খুতবার শেষাংশ.....

কি শুনেছ, তোমার মিত্র উতবাহ্ কী বলছে? আর তা-ও এমন মুহূর্তে যখন তোমার ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার মোক্ষম সুযোগ হাতে এসেছে। আমেরের চোখে রক্ত উঠে যায় আর সে আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নিজের কাপড় ছিঁড়ে এবং বিবস্ত্র হয়ে একথা বলে চিৎকার করতে আরম্ভ করে যে, 'ওয়া আমরাহো, ওয়া আমরাহো'- হায় পরিতাপ! আমার ভাইয়ের খুনের বদলা নেওয়া হচ্ছে না, হায় পরিতাপ! আমার ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে না। এই মরুক্রন্দন কুরাইশ বাহিনীর হৃদয়ে শত্রুতার অগ্নিশিখা প্র জ্জ্বলিত করে আর যুদ্ধাগ্নি প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম. এ, পৃ: ৩৫৮-৩৬০)

এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণ না করা হবে।

****

১ ম খুতবার শেষাংশ.....

সাহেব, মুহাম্মদ মুআযুলহুসনি এবং ফুয়াযুল হুসনি ছাড়াও এক কন্যা সন্তান রয়েছে, তার নাম যয়নাবুল হুসনি। পৌত্র-পৌত্রীও রয়েছে আর তারা সবাই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিষ্ঠাবান আহমদী।

মরহুমের পুত্র মুআযুল হুসনি সাহেব বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা চাইতেন আমরা সব ভাইবোন যেন পুরো আশ্বস্ত হয়ে জামা'তভুক্ত হই। আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা পূর্ণ ঈমানের সাথে বয়আত করেছি। সৌদি আরবে থাকার সময় তিনি জামা'তের সন্ধান করতে থাকেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের অধিবাসী মরহুম হাসেম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয় যিনি সেখানে কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমাদের পিতা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামা'তের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অত্যন্ত দয়ালু ও খোলা মনের মানুষ ছিলেন। অন্যদের সাহায্য করা তার পছন্দনীয় বিষয় ছিল। তিনি আরও লিখেন, ২০১৯ সনে তাকে ডেকে নিয়ে কারাবন্দি করা হয়। অনেক চেষ্টা ও খোঁজখবর করার পর জানা যায়, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার বিরুদ্ধে আহমদী হওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তবলীগ করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, দুই বছর পর্যন্ত আমরা তার মুক্তির সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি। বেশ কয়েকজন উকিলের সহায়তা নেয়া হয়। তার মুক্তির আদেশও জারি হয় আর তা কার্যকরও হয়, কিন্তু মুক্তি দেয়ার কয়েক ঘন্টা পরই পুলিশ তাকে ফোন করে থানায় ডাকে এবং পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে। এবার তার ওপর পূর্বের তুলনায় বেশি কঠোরতা করা হয়। তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না আর ফোনে কথা বলারও অনুমতি পাওয়া যায়নি। তার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। রোগ ও বার্ধক্যের কারণে তিনি অসুস্থ হতে থাকেন আর হাসপাতালেও যেতে থাকেন, কিন্তু তার পরিবারের লোকদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি।

তার বড় পুত্র আব্দুর রউফ হুসনি কানাডায় বসবাস করেন। তার সম্পর্কে তিনিও লিখেন যে, জামা'তের প্রতি তিনি অনেক নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক ছিলেন।নিজের ধর্বিশ্বাসের ওপর তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও তার ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি কিছুটা বিস্তারিত লিখেছেন। অর্থাৎ ২০১৬ সালে তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তিনি রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু বন্দিদশায় তাকে অনেক দু ঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে তা জানা সত্ত্বেও তিনি রোযা ভাঙা পছন্দ করেননি। অফিসার তাকে পানি দিলে তিনি বলেন, আমি রোযাদার আর আসর নামায পড়ার অনুমতি চাইলে সে অনুমতি দিয়ে দেয়। তিনি তার সামনেই নামায পড়েন। তখন সে বলে উঠে, আপনারা দেখছি আমাদের মতই নামায পড়েন। যাহোক তার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে, ফলে তখন তাকে সে ছেড়ে দেয়। পরে ২০১৯ সনে পুলিশ কোনো কারণ উল্লেখ না করেই পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করে নেয় আর এই কারাবন্দি অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার পদমর্যদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার বিভিন্ন পুণ্য ও গুণাবলী অবলম্বনের তৌফিক দান করুন। নামাযের পর আমি জানাযার নামাযও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir